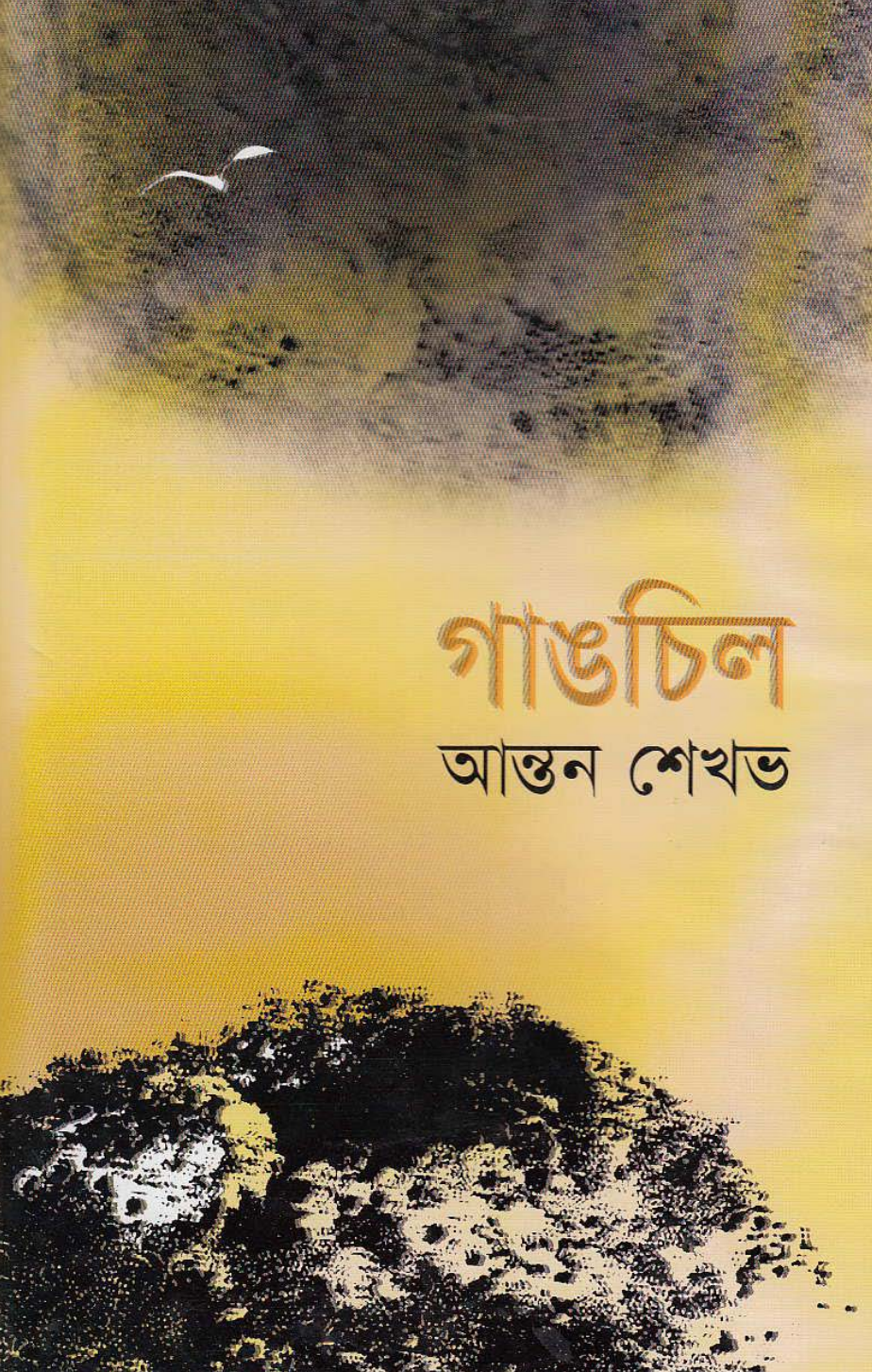

গাঙচিল

আন্তন শেখভ

চিরায়ত গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

আন্তন শেখভ

গাঙচিল

অনুবাদ

খায়রুল আলম সবুজ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৬৬

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
কার্তিক ১৪১৭ অক্টোবর ২০১১

প্রকাশক
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0165-5

উৎসর্গ

থিয়েটার
আমার দ্বিতীয় ঘর

ভূমিকা

আন্তন পাবলোভিচ শেখভ ১৮৬০ সালের ২৯ জানুয়ারি (মতান্তরে ১৭ জানুয়ারি ১৮৬০) জন্মগ্রহণ করেন। রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে আজভ উপসাগরের ধারে বাণিজ্যশহর তাগানরোগে তাঁর জন্ম। শেখভের পিতামহ সামন্তপ্রভুদের ভূমিদাস হিসেবে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী এবং সর্বোপরি স্বাধীনচেতা। তাঁর সততা ও শ্রম দিয়েই তিনি প্রভুদের কাছ থেকে তাঁর নিজের স্বাধীনতাটুকু ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাগানরোগেই স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছিলেন। শেখভের বাবা ছিলেন কঠোরভাবে নিয়ম মেনে-চলা মানুষ। তাঁর কঠোর নিয়মের নিগড়ে বাঁধা ছিল তাঁর স্ত্রী ও ছয়টি সন্তান। অত্যন্ত শান্ত ও চারুশীলা মহিলা ছিলেন শেখভের মা। ছোট্ট শহরে বেশ কাটছিল পরিবারটির। শেখভ শৈশবে নিয়মিতভাবেই তাঁর বাবার ব্যবসায় সাহায্য করতেন, দোকানে বসতেন। তবে শেখভের বাবা ব্যবসার কাজে অতটা হিসেবি ছিলেন না। ভুল পথে টাকা খাটানোর ফলে তিনি ১৮৭৬ সালে দেউলিয়া হয়ে পড়েন। উপায়ন্তর না দেখে জমিজমা বাড়ি-ঘর বিক্রি করে তাগানরোগের পাততাড়ি গুটিয়ে তিনি পাড়ি জমালেন মস্কো শহরে। শুধু শেখভ একা লেখাপড়ার কারণে আরো তিন বছরের জন্য তাগানরোগে থেকে যান। পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই তিনটি বছর আন্তন শেখভের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। নিজের উপার্জনের ওপর নির্ভর করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে হচ্ছিল বলেই তিনি টের পেয়ে যান জীবন কী কঠিন ব্যাপার। চারপাশের পরিচিত-অপরিচিত মানুষদের তিনি একেবারে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। মানুষের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা এবং অসাড় অহঙ্কারের দিকগুলো উপলব্ধি করেন সুস্পষ্টভাবে। দায়িত্ববান উদার ও স্বাধীনচেতা মানুষ আন্তন শেখভের ব্যক্তিত্বগঠনের পর্বটি এখানেই শুরু—এই তাগানরোগে, একা—তিনটা বছর।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হবার পরিকল্পনামাফিক ১৮৭৯ সালের আগস্ট মাসে তাগানরোগ ছেড়ে শেখভ নিজের পরিবারের কাছে চলে আসেন মস্কোয়। এর মাঝেই তাঁর বাবার শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুতরাং মস্কো ফিরেই তাঁকে পরিবারপ্রধানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় এবং এই ভূমিকা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হয়। মস্কোতে তাঁর লেখাপড়া ও পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন দুটোই পাশাপাশি চলতে থাকে। বড় ভাই আলেকজান্ডারের পরামর্শ অনুযায়ী শেখভ রম্য পত্রিকাগুলোতে ছোটো ছোটো লেখা

পাঠাতে শুরু করেন মূলত অর্থ উপার্জনের জন্যেই। প্রথম লেখা ছাপা হয় সেন্ট পিটার্সবুর্গের *স্ট্রেকোজো* পত্রিকায় ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে। অর্ধশিক্ষিত, ফাঁপা, লোক-দেখানো মানুষের প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণাকে ব্যঙ্গ করে তিনি তাঁর প্রথম লেখাটি লেখেন। এর পরবর্তী চার বছর তিনি মস্কো শহরের রাস্তাঘাটে দেখা সাধারণ মানুষের জীবন-আচার-আচরণ উপজীব্য করে মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবুর্গের বিভিন্ন পত্রিকায় অসংখ্য লেখা লিখেছেন। ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে। শেখভ সারাটা জীবন নিজের দেখা সাধারণ মানুষের আদলে তাঁর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যে শেখভকে আমরা শক্তিশালী নাট্যকার হিসেবে পরবর্তীকালে পাই তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ১৮৮২ সালে 'লেডি অব দ্য ম্যানর' ও 'লেট-ব্লুমিং ফ্লাওয়ারস' গল্প দুটি প্রকাশের মাধ্যমে।

একদিকে ডাক্তারি ডিগ্রির জন্য পড়াশুনা অন্যদিকে সংসার চালানোর দায়িত্ব—এই দুয়ের জন্য তাঁকে কঠিন পরিশ্রম করতে হচ্ছিল।

১৮৮৪ সালে ডাক্তারি ডিগ্রি লাভ করেন শেখভ। ডিগ্রি পাওয়ার পর ডাক্তারি করা শুরুও করেন তিনি। কিন্তু রোগী হিসেবে যাদেরকে পাওয়া গেল তাদের বেশিরভাগই ছিল হতদরিদ্র সাধারণ মানুষ। সুতরাং অর্থ উপার্জনের জন্য তাঁকে লেখালেখির ওপর আরো বেশি করে নির্ভর করতে হল। এই সময়ই তাঁর ক্ষয়রোগটা ধরা পড়ে।

১৮৮৩ থেকে ১৮৮৬ এই তিন বছর তিনি নিকোলাই লেইকিনের কাগজে ধারাবাহিকভাবে 'ফ্র্যাগমেন্টস অব মস্কো লাইফ' নামে একটি কলাম লেখেন। কলামটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নগরজীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতিকে আক্রমণ করে লেখা এই কলাম পাঠকদের চমকে দিত। এই কলামসহ প্রায় তিনশত বিচিত্র লেখা নিকোলাই লেইকিনের কাগজে প্রকাশিত হয়।

'ফ্র্যাগমেন্টস অব মস্কো লাইফ' ও অন্যান্য লেখা লিখতে গিয়ে শেখভের সঙ্গে জীবনের বাস্তবতার একটা স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ-তীব্র হয়ে ওঠে তাঁর বোধ ও লেখনী-ক্ষমতা। 'পিটার্সবুর্গ গেজেটে' প্রকাশিত শেখভের এই সময়ের লেখাগুলোতে একজন পরিণত এবং প্রতিভাবান লেখকের ছাপ সুস্পষ্ট। পরিণত একজন লেখক হিসেবে বেড়ে ওঠার এই সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল জীবনের যা কিছু সুখ-দুঃখ সেটা নিত্যদিনের জীবনের ভিতর থেকেই আসে। শুধু কল্পনার কোনো ব্যাপার নয় এটা।

১৮৮৫ সালের কোনো-এক সময়ে শেখভ পিটার্সবুর্গে লেইকিনের কাছে বেড়াতে গেলেন। এখানেই প্রথমবারের মতো টের পেলেন যে তিনি এর মাঝেই নীরবে একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। প্রকাশনা শিল্পের জগতে, গুণীজ্ঞানী ও গণ্যমান্য পাঠক সমাজে তার আলাদা সমাদর। এতদিন এটা একেবারেই বুঝতে পারেননি তিনি। সাহিত্যচক্রে তাঁকে নিয়ে সপ্রশংস আলোচনা হচ্ছে দেখে তিনি আনন্দিত ও উৎসাহিত হলেন। এ-যাবৎ তাঁর লেখালেখি তিনি ছদ্মনামেও প্রকাশ করেছেন। ১৮৮৬ সালের মার্চে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক দিমিত্রি গ্রিগোরোভিচের কাছ থেকে শেখভ একটি চিঠি পান। চিঠিতে দিমিত্রি ছদ্মনামে লিখে নিজের প্রতিভার

অবমাননা না করার জন্য শেখভকে পরামর্শ দেন। পরামর্শ অনুযায়ী শেখভ ছদ্মনাম ব্যবহার করা ছেড়ে দেন। এই সময় তাঁর সাথে বিখ্যাত সাহিত্য সম্পাদক এ. এস. সুভোরিনের পরিচয় হয়। শেখভ সুভোরিনের পত্রিকায় লিখতে থাকেন। 'সার্জেন্ট প্রিশিবিভ', 'দা হান্টার' এবং 'গ্রিফ' তাঁর এই সময়ের খুবই সফল গল্প। এরপর থেকে শেখভ শুধু বিশুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকায় লিখতে থাকেন।

১৮৭৮-৮১ সালের মধ্যে খেলার ছলেই তিনি লিখে ফেলেন 'প্ল্যাটানভ' নাটক আর এই লেখার মধ্যে দিয়েই নাট্যাঙ্গনে শেখভের যাত্রা শুরু। এই পর্যায়ের লেখা তাঁর প্রথম মঞ্চায়িত নাটক 'আইভানভ' ও অনেকগুলো একাঙ্কিকা যেমন—'দ্য বিয়ার' (১৮৮৮), 'দ্য ম্যারেজ প্রোপোজাল' (১৮৮৮) ইত্যাদি। ১৮৮৯ সালে শেখভ প্রথম 'দ্য উড ডেমন' নামে একটা লিরিকাল প্লে লেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা তার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। ফলে বহুদিন আর নাটকে হাত দেননি তিনি। শুধু গল্প লিখেছেন। এই সময়ের গল্পগুলোতে তিনি টলস্টয়কে অনুসরণ করেছেন। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন টলস্টয়। দুর্জনকেও শুধু ভালোবাসা দিয়ে ফিরিয়ে আনা যায়, তাঁর এই ধারণায় শেখভ প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

জীবনের হাজার ঝামেলা ও মানুষের স্থূল আচরণে শেখভের সূক্ষ্ম বোধগুলো মাঝে মাঝে যন্ত্রণাবিদ্ধ অস্থির হয়ে পড়ত। এমনি এক মানসিক অবস্থাতে তিনি একবার সাইবেরিয়া ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন ১৮৯০ সালে। বাসে চড়ে সোজা চলে যান যেখানে দণ্ডিত অপরাধীরা ঘর-বাড়ি করে জীবন কাটাচ্ছে সেই সাখালিন দ্বীপে। এই সাখালিন দ্বীপের অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'সাখালিন'। বইটি প্রকাশিত হবার পর জেলখানার প্রচলিত নিয়মের কিছু কিছু সংস্কার করা হয়েছিল।

১৮৯১ সালের মার্চ মাসে শেখভ মানসিকভাবে আবার অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সুভোরিনকে সঙ্গে নিয়ে এবার তিনি পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন কিন্তু ছয় সপ্তাহ যেতে না যেতেই বাড়ি ফেরার জন্য উতলা হয়ে ওঠেন। হতে পারে বছরখানেক আগে সাখালিন দ্বীপে যে অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল তারই আলোকে একটা কিছু লেখার ইচ্ছা তাঁর মাঝে প্রবল হয়ে উঠেছিল। ফিরে এসে তৎকালীন রাশিয়ার সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে বিদ্রূপ করে তিনি লিখতে শুরু করেন। যাঁরা বুদ্ধিজীবীর বেশ ধরে শুধুমাত্র বড় বড় কথা বলেন, দর্শন আওড়ান এবং কোনো কাজ না করে অলস সময় কাটান তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে কলম ধরেন। অসাধুর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার টলস্টয়ী দর্শন তিনি একেবারেই ত্যাগ করেন। এই দর্শন খণ্ডাবার জন্য লেখেন 'ডুয়েল' (১৮৯১) এবং 'ওয়ার্ড নং ৬'। এ প্রসঙ্গে এই দুটি গল্পই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজের সুখদুঃখ এবং তাঁর নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে শেখভ যথার্থই সচেতন হয়ে ওঠেন এবং লেখাকেই তাঁর হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন। এই অবস্থায় যাতে অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে লেখালেখির কাজ চালাতে পারেন সেজন্য ১৮৯২ সালের বসন্তে তিনি মস্কোর কাছে 'মেলিখোভো' নামে একটি খামারবাড়ি ক্রয় করেন। কিন্তু

শান্তি তেমন এল না। চারপাশের অঞ্চলে কলেরা মহামারীর আকার ধারণ করল। ডাক্তার হিসেবে শেখভ চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না—মানুষের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করলেন। পরবর্তী দুবছরের মধ্যে তাঁর যক্ষ্মা রোগের অবনতি ঘটলে ডাক্তারের পরামর্শে পরিবার-পরিজন নিয়ে তিনি ইয়াল্টায় যেতে বাধ্য হলেন। এর মাঝেই তিনি গাঙচিল (সী-গাল) লিখতে শুরু করেছিলেন। নাটকটি তিনি আলেকজান্দ্রিনিস্কি থিয়েটারে দেন মঞ্চস্থ করার জন্যে। ১৭ অক্টোবর ১৮৯৬ সালে যথারীতি নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু নাট্যকারের নাট্যধারণার সাথে পরিচালক অথবা অভিনেতা-অভিনেত্রী কারোরই সঠিক বোঝাপড়া না হওয়ায় 'সী-গালে'র প্রথম মঞ্চায়ন সম্পূর্ণরূপেই হয়ে পড়ে একটি অসফল মঞ্চায়ন। ব্যাপারটি শেখভকে কষ্ট দেয়। তিনি আবার গল্প লেখায় মন দেন।

১৮৯৭ সালের মার্চ মাসে প্রথম তাঁর ফুসফুস থেকে রক্তক্ষরণ হয়। এই বছরই ফরাসি রাজনৈতিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সোভোরিনের সাথে তাঁর বন্ধুতায় কিছুটা শিথিলতা আসে এবং তিনি ফ্রান্স থেকে মেলিখোভোতে ফিরে আসেন। শরীরের অবস্থার জন্য ডাক্তাররা তাঁকে স্থান পরিবর্তন করতে বললে তিনি তাঁর বাবার মৃত্যুর পর মেলিখোভো বিক্রি করে মা-বোনদের নিয়ে ১৮৯৯ সালে স্থায়ীভাবে ইয়াল্টাতে চলে আসেন। পরবর্তী তিন বছর শেখভ তাঁর লেখাগুলো সংগ্রহ করে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে একটি রচনাসমগ্র প্রকাশ করার পেছনে কাটান। ১৮৯৫ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত পুরো সময়টি শেখভ নাট্যসংস্কারক হিসেবে চিহ্নিত। প্রচলিত নিয়মের বাইরে এসে তিনি নাট্যাঙ্গনে একটি ভিন্ন ধারার প্রবর্তন করেন।

ভ্লাদিমির নমিরোভিচ দাংশেঙ্কো ও কনস্টানটিন স্তানস্লাভস্কির মস্কো আর্ট থিয়েটার স্থাপন শেখভের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা। তাঁরা শেখভের 'সী-গাল'কে পুনঃমঞ্চস্থ করতে চান—শেখভ তাদের অনুমতি দেন। 'সী-গালের' মহড়াতে ওলগা নিপার-এর সাথে তাঁর প্রথম দেখা। নিপার তখন সী-গালে ম্যাডাম আরকাডিনার চরিত্র রূপায়ণ করছিলেন। ১৮৯৮ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটারের 'সী-গাল' মঞ্চায়ন সাংঘাতিকভাবে সফল হয়। এই সূত্রেই ওলগা নিপার-এর সাথে শেখভের মাঝে মাঝে দেখা হতে থাকে এবং ১৯০১ সালে মে মাসের ৬ তারিখে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দম্পতি গ্রীষ্মকালটি শুধু একত্রে কাটিয়েছিলেন। তারপর শেখভের পীড়াপীড়িতেই নিপার অভিনয়ের জীবন চালাতে থাকেন। থিয়েটার মৌসুমে তিনি মস্কোতেই কাটাতেন আর শেখভ থাকতেন দক্ষিণে। মাঝে মাঝে তাঁদের দেখা হত।

শেখভ মস্কো আর্ট থিয়েটারের জন্য লিখতে থাকেন। ১৯০১ সালে লেখেন তিনি 'থ্রি সিস্টারস'—১৯০৩ সালে তাঁর শেষ নাটক 'চেরি অর্চার্ড' লিখিত হয়। অসুস্থ শরীরের ঝুঁকি নিয়েই তিনি 'চেরি অর্চার্ড' শেষ করেন। থেকে থেকে মস্কো রিহার্সালে যোগদান করার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের দারুণ অবনতি হয়। চিকিৎসার জন্য তাঁর স্ত্রী নিপার তাঁকে দক্ষিণ জার্মানিতে নিয়ে যান—কিন্তু কোনো সুবিধা হল না। ১৯০৪ সালের ১৫ জুলাই শেখভ লোকান্তরিত হন।

শেখভের নাট্যকর্ম ও গাঙচিল

শৈশবে পারিবারিক অসচ্ছলতার দিনগুলো, ছাত্রজীবনে পুরো পরিবারের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা, বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যেই দেহে যক্ষ্মা রোগের মতো একটি মারাত্মক রোগের আবিষ্কার, বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার সামাজিক অস্থিরতা—এই ধরনের বাহ্যিক কারণগুলো শেখভের সাহিত্যকর্মকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। শেখভ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি সত্য কিন্তু সমাজ নিয়ে ভেবেছেন, সমাজ সংস্কারের কথা ভেবেছেন, মানুষকে নিয়ে ভেবেছেন, মানুষের জন্য কাজ করেছেন, মানুষ নিয়েই তাঁর সারা জীবনের সাহিত্যকর্ম। যেহেতু মানুষ নিয়েই সমাজ এবং সমাজ নিয়েই রাজনীতি সুতরাং শেখভ রাজনীতি যে করেননি সেটা বলাও ঠিক হবে না।

প্রথম নাট্যপ্রয়াস *প্লাটনভ* (১৮৭৮-৮১)। নাটকটি তিনি মালি থিয়েটারের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন কিন্তু সে নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। *প্লাটনভ* নাটকের একটি খসড়া পাণ্ডুলিপি ছাড়া নাটকটি সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। এ নাটকে পরিণত নাট্যকার শেখভের কোনো চিহ্নই নেই। তবে বিষয়বস্তু ও প্রতীক ব্যবহারের চেষ্টা অথবা অভিনেতা-অভিনেত্রীর আচরণ খুব ভালোভাবে লক্ষ করলে পরবর্তী শেখভের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রথম দিকে শেখভ তাঁর নিজের লেখা গল্প ও রম্য লেখাগুলোর নাট্যরূপ দিয়েই তাঁর নাট্যকার-জীবন শুরু করেছেন। *ইন দ্য অটাম* (১৮৮৩) গল্প থেকে *অন দ্য হাইরোড* (১৮৮৪) নাটকটি সে রকম একটি প্রয়াস। *অন দ্য হাইরোড* অবশ্য প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ থেকে আলাদা এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে অনেকটাই অগ্রসর ছিল বলে তা অশ্লীলতার দায়ে পড়ে এবং সঙ্গত কারণেই সে সময় ছাড়পত্র পায়নি বলে কোনোদিনই মঞ্চস্থ হতে পারেনি। *দ্য সোয়ান সঙ* (১৮৮৮) নাটকটিও শেখভের একটি গল্পের নাট্যরূপ। এগুলোকে পূর্ণাঙ্গ নাটক বলা যায় না।

শেখভের প্রথম দিকের নাট্যপ্রয়াসগুলো ফরাসি প্রহসন এবং নৃত্যগীতসমৃদ্ধ এক ধরনের রাশিয়ান লোকনাট্যের অনুকরণে রচিত। এই নাটকগুলোয় নির্দোষ আনন্দ দেয়ার মধ্যেও মানুষ সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্পষ্ট চোখে পড়ে। *দ্য বিয়ার* (১৮৮৮), *দ্য ট্রাজেডিয়ান ইন স্পাইট অব হিমসেলফ* (১৮৮৯), *দ্য ওয়েডিং* (১৮৮৯), *দ্য ম্যারেজ প্রোপোজাল* (১৮৯০), *দ্য এনিভার্সারি* (১৮৯১)—এ সবই তাঁর কোনো না কোনো গল্প বা রম্যরচনা অবলম্বনে রচিত একাঙ্কিকা।

এর পরেই তাঁর বিশেষ কাজগুলো শুরু হয়।

তাঁর পরিণত ও পূর্ণাঙ্গ নাটক চারটি: *দ্য সী-গাল* (১৮৯৬), *আঙ্কল ভানিয়া* (১৮৯৯), *দ্য থ্রি সিস্টার্স* (১৯০১), *দ্য চেরি অর্চার্ড* (১৯০৪)।

প্লাটনভ তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক হলেও সেটা কখনোই মঞ্চস্থ হয়নি। ১৮৮৭ সালে লেখা শেখভের আরেকটি পূর্ণাঙ্গ নাটক *আইভানভ*। *আইভানভ* আসলে *প্লাটনভেরই* একটি মার্জিত ও পরিণত রূপ। *আইভানভ* বিষয়ের দিক থেকে অনেকটা সুবিন্যস্ত এবং এখান থেকেই পরিণত শেখভের প্রকাশ শুরু—যদিও বাহ্যিক ব্যাপারটি তখনো প্রাধান্য

পাচ্ছিল। কিন্তু যে শেখভ অন্তর্গত মনোজাগতিক বোধগুলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তার দেখাও *আইভানভ*-এ প্রথম পাওয়া যায়। সংলাপ ও প্রতীক ব্যবহার করে তিনি মানুষের ভেতরের মানুষটাকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। ঘটনার পাশাপাশি বিন্যাসই শুধু নয় চরিত্রের মনের ভাবটিকেও তিনি প্রকাশ করেছেন। এই রীতি শেখভের পরিণত নাট্যকর্মে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা পড়ে।

এ ছাড়াও *দ্য উড ডেমন* নামে শেখভ একটি কাব্যধর্মী নাটক লিখেছিলেন ১৮৮৯ সালে। টলস্টয়ের ঢঙে অনেকটা মরালিটি প্লে গোছের ছিল নাটকটি। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার মনোকষ্টে শেখভ পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখাই প্রায় ছেড়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন। শুধু গল্প ও কিছু একাঙ্কিকা লেখায় মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি তখন।

গাঙচিল মূলত হতাশাগ্রস্ত কিছু মানুষের গল্প। মাদাম আরকাডিনা একজন অত্যন্ত সফল অভিনেত্রী, তবে বয়সে এখন আর তরুণী নন। তিনি বেড়াতে আসেন তাঁর ভাই সোরিনের খামারবাড়িতে। সঙ্গে প্রেমিক ট্রিগোরিন। ট্রিগোরিন নামকরা লেখক। আরকাডিনার ছেলে কনস্টানটিন ত্রেপলেভও নাটক লেখার চেষ্টা করে। তবে প্রচলিত প্রথায় নয়। একটু অন্য ধরনের। ত্রেপলেভ মামার কাছেই থাকে। মা বাড়িতে আসাতে সে তার প্রেমিকা নীনাকে নিয়ে তার লেখা একটি প্রতীকী নাটক মঞ্চস্থ করার আয়োজন করে। মাকে খুশি করার জন্যই এই আয়োজন। কিন্তু মা কিছু চিন্তা না করেই নাটক সম্পর্কে উল্টোপাল্টা মন্তব্য করে বসেন—ব্যাপারটি ত্রেপলেভের অত্যন্ত খারাপ লাগে। সে ক্ষেপে গিয়ে নাটক বন্ধ করে বেরিয়ে যায়।

প্রখ্যাত লেখক ট্রিগোরিনের সাথে নীনার পরিচয় হয়। নীনা লেখকের খ্যাতি ও মার্জিত আচরণে মুগ্ধ হয় এবং তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে, ফলে ত্রেপলেভের সঙ্গে দিন দিন তার সম্পর্ক শিথিল হতে থাকে। একদিন ত্রেপলেভ একটি গাঙচিল মেরে এনে নীনার পায়ের কাছে রাখে। নীনা ব্যাপারটি তেমন করে বুঝতে পারে না। এটাকে সে মুডি ত্রেপলেভের অন্য একটি কাণ্ড হিসেবেই ধরে নেয়। কিন্তু ত্রেপলেভ নীনাকে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছিল যে তার সঙ্গে নীনার আচরণের কারণে সে হয়তো আত্মহত্যাও করতে পারে। এ ঘটনায় ট্রিগোরিন একটি গল্পের প্লট চিন্তা করে। ঘটনার এক পর্যায়ে ত্রেপলেভ একবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করে। নীনা এর মধ্যেই ট্রিগোরিনের কাছে তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে। আরকাডিনা ট্রিগোরিনকে হারানোর ভয়ে হঠাৎ করে তাঁকে নিয়ে শহরে ফিরে যায়। আরকাডিনার কাছ থেকে সরে আসার চেষ্টা করেও ট্রিগোরিন তা পারে না। তবে সে নীনাকে মস্কোতে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে এ-কথা বলে যায়। নীনাও একসময় মস্কো চলে যায়।

মাঝে দু বছরের ব্যবধান। মাদাম আরকাডিনা ও ট্রিগোরিন আবার সোরিনের খামারবাড়িতে বেড়াতে আসেন। এর মাঝে কনস্টানটিন ত্রেপলেভ লেখক হিসেবে কিছুটা নাম করেছে। কিন্তু নীনা ছাড়া জীবনে তার কোনো সুখ নেই। নীনা এখন

মফস্বলের একটি কোম্পানিতে অভিনয় করে। মাঝে কিছুদিন ট্রিগোরিনের উপপত্নী হিসেবে কাটিয়েছে। কিন্তু ট্রিগোরিন আবার আরকাডিনার কাছে ফিরে গেছে।

শেষ দৃশ্যে এই বাড়িতে রাতে সবাই যখন তাস খেলায় ব্যস্ত নীনা তখন এসে ত্রেপলেভের ঘরে প্রবেশ করে। ত্রেপলেভ আনন্দিত হয়। নীনাকে থেকে যেতে বলে। কিন্তু নীনা জানায় এখনো সে ট্রিগোরিনকে ভালোবাসে।

নীনা রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে গেলে ত্রেপলেভ তার সমস্ত পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। এক ঘরে তাস খেলা চলতে থাকে অন্য ঘরে ত্রেপলেভ আত্মহত্যা করে।

'গাঙচিল' প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৭ অক্টোবর ১৮৯৬ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গের আলেকসান্দ্রিসকি থিয়েটারে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হয় এই মঞ্চায়ন। এই অসফল মঞ্চায়নের কারণ আসলে নব-নাট্যধারা। শেখভের নাট্যবোধ বা ধারণাকে আলেকসান্দ্রিসকি থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী অথবা পরিচালক কেউই বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁরা সনাতনী চিন্তা-প্রচলিত নিয়মে এই নাটক পরিচালনা এবং অভিনয় করেছিলেন। প্রচলিত নিয়মে নাটকে গল্প এবং অ্যাকশনই প্রধান। কিন্তু শেখভের চরিত্রগুলো ফোটাতে হলে সংলাপ এবং মুডকে বিশেষভাবে ব্যবহার করতে হবে। সেজন্য বিশেষ সেটও প্রয়োজন। জীবন যেমন তেমনিভাবে মঞ্চায়ন না করার ফলে এই বিপর্যয় ঘটে। গাঙচিলের ব্যর্থতার শেখভ প্রায় ভেঙে পড়েছিলেন, শরীরও খারাপ হতে শুরু করেছিল। ১৮৯৭-এর মার্চ মাসে অনেকটা এই কারণেই তাঁর প্রথম ফুসফুসের রক্তক্ষরণ হয়। যাই হোক এই সময়েই জন্ম হয় মস্কো আর্ট থিয়েটারের। শেখভেরই বন্ধু ভ্লাদিমির নেমিরোভিচ দানশেঙ্কো এবং কনস্টানটিন স্তানস্লাভস্কি দুজনে মিলে মস্কো আর্ট থিয়েটার গঠন করেন। রাশিয়ার নাটকে একটি নতুন ধারা জন্ম দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই মস্কো আর্ট থিয়েটারের জন্ম হয় এবং আশ্চর্যভাবে শেখভ ও স্তানস্লাভস্কির যোগাযোগটি ঘটে যায়। স্তানস্লাভস্কি তাঁদের কোম্পানি থেকে *গাঙচিল* নতুনভাবে মঞ্চস্থ করার প্রস্তাব করেন। শেখভ রাজি হয়ে যান। ১৮৯৮ সালে 'গাঙচিল' মস্কো আর্ট থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় এবং অসাধারণ সাফল্য লাভ করে।

স্তানস্লাভস্কির আন্তরিক ও দক্ষ পরিচালনার কারণে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নাটকের মূল সুর সহজেই ধরতে পেরেছিলেন আর সে কারণেই অভিনয় প্রাণবন্ত হয়েছিল। নাটকের নাট্যকার পরিচালক পাত্র-পাত্রী একই সুরে বাঁধা পড়লে তবেই তো সাফল্য আসে।

মস্কো আর্ট থিয়েটারে *গাঙচিলের* সাফল্য শেখভকে কেবল যে উজ্জীবিত করেছিল তাই নয়, এই সাফল্য প্রচলিত নাট্যধারার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল এবং মস্কো আর্ট থিয়েটারকে 'থিয়েটার অব মুডস' নামে আখ্যায়িত হবার সুযোগ দিয়েছিল। এই সাফল্য থেকেই শুরু হয়েছিল জগৎব্যাপী একটি আধুনিক নাট্যধারার।

৩৯৯/এ নিউ ইস্কাটন
ঢাকা ১২১৭

খায়রুল আলম সবুজ

চরিত্র

আইরিনা নিকোলাইয়েভনা আরকাডিনা	:	একজন অভিনেত্রী
কনস্টানটিন গেভ্রিলোভিচ ত্রেপলেভ	:	তাঁর ছেলে
পিওতর নিকোলায়েভনা সোরিন	:	তাঁর ভাই
নীনা মিহাইলোভনা যারেখনি	:	অবস্থাপন্ন গৃহস্থের যুবতী মেয়ে
ইলিয়া আফানাসায়েভিচ সামারায়েভ	:	সোরিনের খামারবাড়ির তত্ত্বাবধায়ক
পোলিনা আন্দ্রেইয়েভনা	:	তাঁর স্ত্রী
মাশা	:	তাঁর মেয়ে
বরিস আলেইভিচ ট্রিগোরিন	:	বিখ্যাত লেখক
ইয়েভজিনি সারগেইভিচ ডোরন	:	একজন ডাক্তার
সেমিওন সেমিওনোভিচ মেদভাদেনকো	:	একজন স্কুলমাস্টার
ইয়াকোভ	:	গৃহভৃত্য
রাঁধুনি		
কাজের মেয়ে		

প্রথম অঙ্ক

[সোরিনের বাগানবাড়ির মাঝখানে একটি খোলামেলা জায়গা। কাছেই একটি লেক। বাগানের গাছপালার সারি লেক পর্যন্ত চলে গেছে। দর্শকসারি থেকে লেকটি দেখা যায় না। বাগানের মধ্যে কোনোরকমে তৈরি একটি মঞ্চ। চারপাশে এলোমেলো নলখাগড়ার বন।
চেয়ারগুলো বিক্ষিপ্ত ছড়ানো। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। পর্দার পিছনে ইয়াকোভ মঞ্চের কাজ করছে। বাইরে থেকে এসে প্রবেশ করে মাশা ও মেদভাদেনকো।]

মেদভাদেনকো : মাশা, কালো কাপড়ে তুমি কী পেলে? ঐ একই রঙ সব সময়। কী ব্যাপার বল তো?

মাশা : শোক পালন করছি। এখন পর্যন্ত যা বুঝলাম তাতে জীবনে শোক ছাড়া আর কিছু নেই।

মেদভাদেনকো : কেন নেই? [একটু ভেবে] মাশা, একটা ব্যাপার আমি ঠিক বুঝি না। তোমার শরীর-স্বাস্থ্য তো ভালোই। তোমার বাবা হয়তো অতটা ধনী নন, তাতে কী? তাঁর তো কোনো টানাটানিও নেই। একটু আমার কথা ভাব। এই কষ্টের জীবন। মাস শেষে পাই বিশ রুবল। তার থেকে আবার কাটাকাটি আছে। কিন্তু আমি তো তার জন্যে শোক প্রকাশ করি না। তোমার মতো কালো কাপড় পরে ঘুরে বেড়াই না।

মাশা : সুখের মূলসূত্র কি টাকা-পয়সা? সুখ তো একটা ভিখিরিরও হতে পারে।

মেদভাদেনকো : হ্যাঁ, তা পারে। শুধু বই-পুস্তকে, নাটক-নভেলে। কঠিন বাস্তব জীবনে ওসব কাজে লাগে না। দেখ, আমার সংসারে মা আছে, আছে দুইটি বোন, ছোট একটা ভাই অথচ সর্বসাকুল্যে আয় বিশ রুব্‌ল। পুরোটাই তো এই দিয়ে চালাতে হয়। তাই বলে আমরা কি খাই না? দু বেলা দু মুঠো খাওয়াই শুধু নয়; মাঝেমধ্যে একটু চা, চিনি, বিড়ি-সিগারেটও তো হয়ে যায়।

মাশা : নাটক কি এখনই শুরু হবে?

মেদভাদেনকো : হ্যাঁ, আজ নীনা অভিনয় করবে। নাটকটি কনস্টানটিন লিখেছে। ওরা দুজনই দুজনকে ভালোবাসে। আজ এই নাটকের মধ্য দিয়েই ওদের দুটি মন একাকার হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের তো

আর কিছু হল না, মাশা। আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে চাই। প্রতিদিন চার মাইল চার মাইল আট মাইল পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া করি—শুধু তোমার জন্য। ঘরে মন টেকে না, চলে আসি, শুধু তোমার জন্যই। অথচ তুমি তার পরিবর্তে আমাকে শীতল ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছুই দাও না। কিছুই না। অবশ্য এর পেছনের সত্যটি যে বুঝি না, তা নয়। আমার অর্থ নেই, সম্পদ নেই। থাকার মধ্যে আছে সমস্যাজর্জরিত একটা বিশাল সংসার। নিত্যদিন এই সংসারের হাল ধরে আমাকে বসে থাকতে হয়। যে লোক নিজেই নিজেকে চালাতে পারে না তাকে তুমি কেন কেউই বিয়ে করতে চাইবে না।

মাশা : বাজে বকো না। [একটিপ নস্যি নেয়] তুমি কি মনে কর ভালোবাসা আমি বুঝি না? বুঝি, খুব বুঝি। শুধু তার ঠিক মূল্য দিতে পারি না। [নস্যির কৌটা এগিয়ে দিয়ে] নাও, ধর।

মেদভাদেনকো : না-না। আর না।

মাশা : আবার বুঝি শুরু করলে। তুমি একবার কথা বলতে শুরু করলে হয় দার্শনিক হয়ে যাও নয়তো শুরু হয় টাকা-পয়সার প্যাঁচাল। তুমি কি মনে কর দারিদ্র্য ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কোনো দুর্ভাগ্য নেই? আমার মনে হয় ছেঁড়া কাপড় পরে ভিখিরি হওয়াও হাজার গুণে ভালো, তবু—না, থাক, তুমি ওসব বুঝবে না।

[সোরিন ও ত্রেপলেভ প্রবেশ করে]

সোরিন : কিছু কিছু কারণে গ্রামে থাকতে আমার একদম ভালো লাগে না। একনাগাড়ে বেশিদিন থাকলে অবশ্য অভ্যস্ত হয়ে যাব তা-ও ঠিক। এই ধর, গতরাতে দশটায় ঘুমিয়েছি, উঠেছি সকাল নটায়। এত দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে মনে হচ্ছিল করোটির সাথে মগজ সেঁটে গেছে। [হাসি] তারপর কী করেছি জানো, খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার ঘুমিয়ে পড়েছি। এখন আমার নিজেকে কেমন যেন বিপর্যস্ত লাগছে। মনে হচ্ছে এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছি।

ত্রেপলেভ : সত্যি মামা। তোমার আসলে শহরে থাকাই উচিত। [মেদভাদেনকো ও মাশাকে দেখে] এই যে তোমাদের তো এখন এখানে দরকার নেই। নাটক শুরু হলে ডাকব, কেমন। এখন যাও।

সোরিন : [মাশাকে] মারিয়া, তোমার বাবাকে একটু বল কুকুরটাকে ওরকম বেঁধে না রেখে একটু ছেড়ে দিতে। চব্বিশটা ঘণ্টা এভাবে বিকট চিৎকার করলে রাতে ঘুমানো যায় না।

মাশা : আপনি নিজে কেন বলেন না? ওসব আমি বলতে পারব না। [মেদভাদেনকোকে] চল যাই।

মেদভাদেনকো : নাটক শুরু হবার আগে আমাদের একটু ডাকবেন, কেমন।
[মাশা ও মেদভাদেনকো বেরিয়ে যায়]

সোরিন : তাহলে কুকুরটা সারারাত চিৎকার করে আজও সবাইকে জাগিয়ে রাখবে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার কী, জানো ভাগ্নে, গ্রামের বাড়িতে এসে আমি কোনোদিনই আমার মনের মতো কিছু করতে পারলাম না। আগে তো মাসখানেকের জন্য একটু নিরিবিলি ছুটি কাটাতে আসতাম। আসতে না আসতেই উটকো মানুষের হাজার রকম ঝামেলা শুরু হয়ে যেত, সুতরাং বুঝতেই পার, আসার সাথে সাথেই আবার যাবার জন্য তৈরি হতাম। [হাসি] যাবার সময় বেশ ভালোই লাগত। এভাবেই এতকাল চলে এসেছে। এখন তো বয়স হয়েছে, অবসর নিয়েছি। কোথাও আর যাবার জায়গাও নেই। ভালো লাগুক আর না লাগুক এখানেই থাকতে হবে।

ইয়াকোভ : কনস্টানটিন, আমরা একটু ডুব মেরে আসি।

ত্রেপলেভ : ঠিক আছে। কিন্তু দশ মিনিটের বেশি দেরি কোরো না যেন। [ঘড়ি দেখে] এখনই শুরু করব।

ইয়াকোভ : আচ্ছা, আচ্ছা। [বেরিয়ে যায়]

ত্রেপলেভ : [মঞ্চের দিকে ইঙ্গিত করে] এই যে মঞ্চ দেখছ মামা, এখানে আসলে কিছু নেই। একেবারেই কিছু নেই। একটা পর্দা, দুটো উইংস, ব্যস্। ওপাশে একেবারে খোলা। লেক ও অবারিত দিগন্ত। কৃত্রিম কোনো দৃশ্য-টৃশ্য নেই। সাড়ে আটটায় আকাশে চাঁদ উঠবে, আমরাও ধীরে ধীরে পর্দা ওঠাব। একেবারে প্রকৃতির মাঝে শুরু হবে পরিবেশ নাটক।

সোরিন : চমৎকার!

ত্রেপলেভ : কিন্তু নীনা দেরি করলে তো পুরো আয়োজনটাই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। না, সময় তো হয়ে গেল, ওর তো এখন চলে আসা উচিত। ঠিকমতো না এলে চাঁদের ইফেক্টটাই পাওয়া যাবে না। নীনার বাবা আর সৎ-মা চব্বিশটা ঘণ্টা ওকে চোখে চোখে রাখে। জেলখানা আর কি। মুহূর্তের জন্যেও ফসকানো দায়। [মামার টাই ঠিক করতে করতে] মামা, তুমি কখনো দাড়ি-চুলে চিরুনি চালাও না, না? একটু কাটা দরকার। নিদেনপক্ষে একটু ছেঁটে তো রাখতে পার।

সোরিন : [দাড়িতে চিরুনি চালাতে চালাতে] আমার জীবনের দুঃখই তো এখানে। আজ বলে নয়, যখন কম বয়স ছিল তখনো আমাকে দেখতে একটা পাঁড় মাতালের মতো লাগত। বুঝলি, মেয়েরা কোনো দিনই পছন্দ করল না। [বসতে বসতে] তোর মা'র আজ কী হয়েছে বল তো, মেজাজটা অমন খিঁচড়ানো ক্যান্?

ত্রেপলেভ : বোর হয়ে গেছে। এখানে ভালো লাগছে না। [সোরিনের পাশে বসে] বিরক্ত এবং কিছু ঈর্ষা, বুঝলে। আমার লেখা নাটকে নীনা অভিনয় করছে, মা করছে না। এই হল তার অভিমান আর বিরক্তির কারণ। আমার ওপর খুব খেপেছে। নিজে করছে না বলে নাটকটা একবার পড়েও দেখেনি, করতেও দিতে রাজি ছিল না। বরং বলতে পার ব্যাপারটিকে দস্তুরমতো ঘৃণা করছে।

সোরিন : তাই নাকি? অদ্ভুত!

ত্রেপলেভ : চিন্তা করে দেখ, এই তুচ্ছ ছোট্ট পাড়াগাঁয়ের মঞ্চে নীনা আধিপত্য বিস্তার করবে এইটুকুও তাঁর সহ্য হয় না। [ঘড়ির দিকে তাকিয়ে] আমার মা আসলে একটা 'কেস' হয়ে গেছে মামা। মানসিক রোগী। মা যে বুদ্ধিমতী এবং প্রতিভাসম্পন্না তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটা উপন্যাস পড়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলতে পারে। নেকরাসভের কবিতা গড় গড় করে মুখস্থ আউড়িয়ে যাবে। আবার দুস্থের সেবার কথা বল, সেখানে সে দেবী। কিন্তু একবার—শুধু একবার তার সামনে অন্য কোনো মেয়ের প্রশংসা কর, তাহলেই হয়েছে। শুধু তাঁর প্রশংসা করে যেতে হবে, তা-ও উচ্ছ্বসিতভাবে। এ পর্যন্ত তাঁর অভিনীত প্রত্যেকটা নাটক সাংঘাতিক হয়েছে, তাঁর অভিনয়ের কোনো তুলনাই হয় না—এসব বলতে হবে। মা যেমন চায় তেমন প্রশংসা তো আর এই গাঁও-গ্রামে পায় না, তাই অমন বিরক্ত আর খিটখিটে। সে মনে করে আমরা সবাই তাঁর শত্রু। আমাদের যা কিছু সবই ভুল আর তাঁর সবকিছুই ঠিক। দেখ-না আবার কুসংস্কারও মেনে চলে—তিন মোমবাতি অথবা তের সংখ্যা—এসবে তাঁর খুব ভয়। মামা, মা কিন্তু দারুণ কৃপণ। ব্যাংকে তাঁর সত্তর হাজার রুব্‌ল আছে আমি জানি, কিন্তু তার থেকে অল্প কিছু ধার চাও, একেবারে কেঁদে ফেলবে।

সোরিন : না-না। আসলে তোর মা তোর নাটক পছন্দ করে না এটা তোর মাথায় ঢুকেছে। সে কারণেই তুই খেপেছিস। কিন্তু জানিস না, তুই যে পথ দিয়ে চলিস সে পথকেও ভালোবাসে তোর মা।

ত্রেপলেভ : [একটা ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে] আমাকে ভালোবাসেন —ভালোবাসেন না—ভালোবাসেন—বাসেন না। [হেসে] আসলে আমার মা আমাকে ভালোবাসেন না। বাসবেনই-বা কেন? তিনি তাঁর মতো করে বাঁচতে চান। এখনো প্রেম করে বেড়ান, দামি দামি কাপড় পরেন। ধর, আমার বয়স এখন পঁচিশ। আমি মা'র সামনে গেলেই তাঁর মনে পড়ে তিনি বুড়িয়ে যাচ্ছেন। এমনিতে তো বয়স তেতাল্লিশ, এই বয়স বাড়াটাও তাঁর একদম সহ্য হয়

না। আমি ধারে-কাছে না থাকলে এমন সব কাণ্ড করেন যেন তাঁর বয়স এক্ষুনি তেইশ হল। আমার বয়সী তাঁর ছেলে আছে এটাই তাঁকে প্রতি মুহূর্তে খোঁচা দিতে থাকে। তাঁর মনের মধ্যে খবর হয় তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে। এ কারণেও তিনি আমাকে দেখতে পারেন না। মা খুব ভালো করেই জানেন আমি নাটক-ফাটক পছন্দ করি না। অথচ থিয়েটারকে মা জান দিয়ে ভালোবাসেন। থিয়েটারের সাথে তাঁর আজীবন ভালোবাসা। তাঁর ধারণা—থিয়েটারের মধ্য দিয়েই তিনি মানবতার শ্রেষ্ঠতম সেবা করছেন। আমার তো ধারণা আমাদের থিয়েটার এখনো এলোপাতাড়ি ভাঙাচোরা পথেই চলছে। কবে কোন কালের সেই বস্তাপচা রীতি! পর্দা উঠলেই সেই তিন দেয়ালের ঘর। দেখা যায় সেই প্রতিভাধর বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নাটক নামের পবিত্র শিল্পে প্রাণ নিবেদন করছেন। অবিরাম খেদমত করে বেড়াচ্ছেন নাটকের। ঝলমলে নাটুকে পোশাক পরে ঘুরেফিরে ফুটলাইটের সামনে এসে সাড়ম্বরে সংলাপ ছুড়ে দিচ্ছেন। তাঁরা দেখাচ্ছেন মানুষ কেমন করে খায়, পান করে, কেমন করে প্রেম নিবেদন করে, বিছানায় যায়। অনুকরণ করে সেই সবই দেখাচ্ছেন। শুধু এই নয়, আবার এই সব অর্থহীন নিতান্ত সাধারণ ঘটনার ভেতর থেকে তাঁরা নীতি-ফিতি ছেনে ঘেঁটে বের করে আনছেন। আরে—যে কোনো লোকই তো এসব জানে। এ তো ঘরের কথা। এই সব বিখ্যাত ব্যক্তিরা যখন বস্তাপচা একই বিষয় হাজার ঢঙে দেখাতে থাকেন তখন সে স্থান ত্যাগ করা ছাড়া আমার আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। আইফেল টাওয়ারের অশ্লীলতাকে ভয় পেয়ে মোপাসাঁ যেমন পালিয়েছিলেন আমারও তেমনি পালাতে হয়।

সোরিন : তাই বলে থিয়েটার ছাড়াটা কি সম্ভব?

ত্রেপলেভ : তা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু শতাব্দী-পুরনো ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে তারও কোনো মানে নেই। দিন পাল্টাচ্ছে। এখন পরিবর্তিত দিনের উপযোগী নতুন কিছুর প্রয়োজন। নতুন কালে নতুন যদি কিছু না-ই দিতে পারি তো কিছু করব না, সেই ভালো। আমার মাকে আমি ভালোবাসি। দারুণ ভালোবাসি। কিন্তু মা'র জীবন! এটা কি কোনো জীবন হল? অর্থহীন অসাড়! কী একজন লেখক পেয়েছে, ব্যস। সারাদিন ওর সাথেই। এই নিয়ে কাগজপত্রে লেখালেখি হচ্ছে—এসব আমার আর ভালো লাগছে না। আমি নিজে, দেখ, অতি সাধারণ লোক অথচ আমার

মা একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী, এই ব্যাপারটা মাঝেমধ্যে আমাকে খুব ভোগায়। আমার মা নামিদামি বিখ্যাত না হয়ে সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ থাকলেই ভালো হত, আমি সুখ পেতাম। আমার মা আমার থাকত।—মানুষের একেবারে একা হয়ে যাওয়ার চেয়ে অসম্ভব আর নৈরাশ্যজনক কিছু কি ভাবতে পার? ঘরভরা গিজগিজ করছে সব বিখ্যাত বিখ্যাত সাহিত্যিক-অভিনেতা-অভিনেত্রী—তার মধ্যে তুমি একা। দিনরাত চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে বিখ্যাত সব মানুষেরা; তার মধ্যে তুমি এক অস্তিত্বহীন মানুষ, ভেবে দেখ তো—তার ওপর তুমি ভালো করেই জান অমন বিখ্যাত মায়ের ছেলে বলেই শুধু তোমাকে সহ্য করা হচ্ছে। এ আমার একেবারেই অসহ্য। আমি কে? আমি কী? নিচের ক্লাসে থাকতেই ইউনিভার্সিটি ছেড়েছি—সে এক ঘটনাচক্র, অবস্থার বিপাক। আমাদের সম্পাদক বলেন—এর ওপর আমাদের কোনো হাত নেই। আমার পরিচয়, কেভের একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। পাসপোর্টে এভাবেই লেখা আছে। সেটা না হয় হল, আমার বাবাও কেভের একজন ছোট ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা ছিল। একজন বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন আমার বাবা। এইসব বিখ্যাত লোকজন যখন আমাদের বাড়িতে আমার মায়ের কাছে আসেন আমি জানি তাঁরা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। আমি তাঁদের চোখ দেখেই বুঝতে পারি—তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। আমার সম্পর্কে তাঁদের কী ধারণা আমি সবই ঠিক ঠিক বুঝতে পারি। তবু সব তিরস্কারই মুখ বুজে সহ্য করি।

সোরিন : এই লেখকটা কী ধরনের লোক রে! আমি তো কিছু বুঝতে পারি না—ও ব্যাটা নিজে থেকেও কিছু বলে না।

ত্রেপলেভ : তেমন কিছু জানি না। তবে মনে হয় বুদ্ধিমান। হাজার আনন্দের মাঝেও কেমন যেন বিষণ্ন। লোক খারাপ না। চল্লিশের কিছু নিচে বয়স। এর মধ্যেই চারদিকে খ্যাতি ছড়িয়েছে। লেখা ধারালো এবং পড়তে ভালো লাগে। তবে টলস্টয়ের কথা যদি বল তবে জোলার পরে আর ট্রিগোরিনের কথা মনে আসে না।

সোরিন : ভালোই। লেখকদের আমি বরাবরই পছন্দ করি। আমার যখন বয়স কম ছিল দুটো জিনিসের প্রতি আমার দারুণ ঝোঁক ছিল—একটা বিয়ে করা, অন্যটা লেখক হওয়া। কোনোটাই হল না। ছোটখাটো সাহিত্যিক হলে তা-ও তো কিছু বলা যেত।

ত্রেপলেভ : [কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করে] মনে হয় কেউ আসছে, তাই না? [সোরিনকে জড়িয়ে ধরে] ওকে না হলে আমি বাঁচব না। শুধু

পায়ের শব্দ পেলেই বুকের মধ্যে আনন্দ টিপটিপ করে আমার। [উঠে প্রবেশপথেই নীনাকে স্বাগত জানায়] এই পায়ের শব্দের মতো সুন্দর কিছু কি হয় আর। আহ্—তুমি শেষ পর্যন্ত এলে। মায়াবিনী স্বপ্ন আমার। এস, এস।

নীনা : [একটু অপ্রস্তুত] দেরি করলাম নাকি? মনে হয় তেমন দেরি হয় নি, কী বল?

ত্রেপলেভ : [হাতে চুমু খেতে খেতে] না-না-না-না-

নীনা : সমস্তটা দিন একটা চাপা আশঙ্কা আর ভয়ের মধ্যে কেটেছে। ভয় ছিল বাবা হয়তো বেরোতেই দেবে না। কিছুক্ষণ আগে ওরা নিজেরাই হঠাৎ বেরোল। লালচে আকাশে চাঁদটা সবে তিরতির করে উঠতে শুধু করেছে। আর দেরি করলাম না। প্রায় হুতাশে ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে চলে এলাম। তবুও আশঙ্কা ছিল। যাক, শেষমেশ এসে পৌঁছেছি। কী যে ভালো লাগছে বোঝাতে পারব না। [সোরিনের হাতে হাত মিলায়]

সোরিন : [হেসে] তুমি কি কাঁদছিলে নাকি? না, না এটা কিন্তু...

নীনা : না, না ও কিছু না। আমি আসলে ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে গেছি। আচ্ছা একটু তাড়াতাড়ি শুরু করলে হয় না? আমি কিন্তু থাকতে পারব না। আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরতে হবে। আমি যে এখানে এসেছি বাবা জানে না।

ত্রেপলেভ : হ্যাঁ—শুরু করার সময়ও হয়েছে। দাঁড়াও, সবাইকে ডাকছি।

সোরিন : তুমি বস, আমি যাচ্ছি। [গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে যাচ্ছিল, 'দুই পদাতিক' বলেই থেমে ঘুরে দাঁড়াল।] অনেকদিন আগে একবার এই গানটা গাচ্ছিলাম। অ্যাসিস্ট্যান্ট কাউন্টি এটর্নি বললেন, 'আপনার গলা কিন্তু দারুণ'—তারপর একটু থেমেই বললেন—'দারুণ বাজে'—[হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়]

নীনা : বাবা আর মা তো আমাকে এখানে আসতেই দেবে না। তাদের মতে মঞ্চে ওঠাটা অশ্লীল, বাউণ্ডেলেপনা। ওদের ভয় আমি মঞ্চে উঠব।—কিন্তু আমি কী করব! এ জায়গা যে আমাকে টানে, আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে আসে এই লেকে, আমি যেন একটা গাঙচিল।

ত্রেপলেভ : নীনা, এই নির্জনে এখন শুধু আমরা দুজন। কাছাকাছি কেউ নেই।

নীনা : না-না, কেউ একজন আসছে।

ত্রেপলেভ : না-না কেউ না—কেউ আসছে না। [দুজনে চুমু খায়]

নীনা : এটা কী গাছ?

ত্রেপলেভ : এলম।

নীনা : অমন অন্ধকার কেন?

ত্রেপলেভ : সন্ধে হয়ে গেছে। চারদিক নিবিড় হয়ে রাত নামছে। তোমার দোহাই লাগে নীনা, তাড়াতাড়ি যেও না।

নীনা : না না—যেতেই হবে। বলে আসিনি।

ত্রেপলেভ : নীনা, আমি যদি তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত যাই? কোনো অসুবিধা হবে? তোমাদের বাগানে তোমার জানালার দিকে তাকিয়ে সারারাত কাটিয়ে দেব।

নীনা : না তোমাকে ওসব করতে হবে না। পাহারদার নির্ঘাত দেখে ফেলবে। তাছাড়া ট্রেসার তোমাকে এখনো চিনে উঠতে পারেনি, দেখলেই ঘেউ ঘেউ শুরু করবে।

ত্রেপলেভ : কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালোবাসি।

নীনা : [মুখে আঙুল ঠেকিয়ে] চুপ চুপ।

ত্রেপলেভ : [পায়ের শব্দ শুনতে পায়] কে? কে ওখানে।—ইয়াকোভ?

ইয়াকোভ : হ্যাঁ আমি। [নেপথ্যে]

ত্রেপলেভ : অ্যালকোহল আর সালফার পেয়েছ? শোন, 'লাল চক্ষু' মঞ্চে আসলে সালফার জ্বালাতে যেন ভুল না হয়। [নীনাকে] তুমি বরং মঞ্চে উঠে পড়। সব তৈরি। কী, বুক কাঁপছে? ভয় হচ্ছে?

নীনা : সাংঘাতিক! তোমার মাকে তেমন না, তবে ট্রিগোরিনকে দারুণ ভয় করছে। এরকম একজন বিখ্যাত লেখক, তাঁর সামনে অভিনয়। না বাবা, আমার লজ্জা করছে। আচ্ছা ট্রিগোরিনের বয়স কত হবে? যুবক নাকি?

ত্রেপলেভ : হ্যাঁ।

নীনা : চমৎকার গল্প লেখেন।

ত্রেপলেভ : কে পড়ে ওসব। আমি কখনো পড়িনি।

নীনা : তোমার নাটকে অভিনয় করা কেমন যেন কঠিন। কোনো জীবন্ত চরিত্র নেই।

ত্রেপলেভ : জীবন্ত চরিত্র! জীবন যেমন তেমনি না যেমনটি হওয়া উচিত তেমনি? সে-সব দেখিয়ে কী লাভ? স্বপ্নে, কল্পনায় মনের মধ্যে যেমন গড়ব সেই তো জীবন।

নীনা : তোমার নাটকে নাটকীয় কোনো ঘটনাই তো নেই, শুধু কথা আর কথা। নাটকে প্রেম থাকবে, ভালোবাসা থাকবে আর তাকে জড়িয়ে ঘটনা ঘটতে থাকবে একটার পর একটা—এ না হলে আবার নাটক কী?

[দুজনে মঞ্চের পেছন দিকে চলে যায়। পোলিনা এবং ডোরন প্রবেশ করে।]

পোলিনা : ইস, দারুণ ঠাণ্ডা এখানে। শোন, তোমার গ্যালশটা পরে নাও—ঠাণ্ডা খুব।

ডোরন : এ ঠাণ্ডায় কিছু হবে না, আমি গরম আছি।

পোলিনা : নিজের শরীরের খেয়াল আর কবে করবে? দিন দিন কেবলি একগুঁয়ে হয়ে উঠছ। তুমি নিজে ডাক্তার এবং খুব ভালো করেই জান এই ভেজা ভেজা বাতাসটা তোমার জন্যে খুবই খারাপ। তবু ইচ্ছে করেই মানুষকে বিপদে ফেলতে চাও। কাল সারারাত শুধু শুধু খোলা আঙিনায় বসে থাকলে।

ডোরন : [গুনগুন করে গান গায়] 'বল না আমায় যেন বসন্তের দিন গেছে চলে।'

পোলিনা : আশ্চর্য! আইরিনার সাথে গল্পে এমনই মেতেছিলে যে ঠাণ্ডা লাগছে সে খেয়ালও ছিল না। ওকে তোমার ভালো লাগে কথাটা স্বীকার করতে তো দোষ নেই।

ডোরন : আমার বয়স কত জান? পঞ্চান্ন চলছে।

পোলিনা : তাতে কী? পুরুষ মানুষের জন্য ওটা কোনো বয়স নয়। দেখতে শুনতে তুমি এখনো বেশ, মেয়েমানুষ আকর্ষণের সব ক্ষমতাই তো তোমার আছে।

ডোরন : হয়তো-বা। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার কী করার আছে, বল।

পোলিনা : সামান্য একজন অভিনেত্রীকে পূজা করার ভঙ্গিতে প্রতি মুহূর্তেই ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। শুধু তুমি নও, তোমরা সবাই।

ডোরন : [গুনগুন করে গায়] 'শুধু আর একটিবার দাঁড়াই তোমার সমুখে।' শিল্পীদের মানুষ চিরদিনই শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে, এখনো দেখে। একজন সেলসম্যানকে যে চোখে দেখি শিল্পীকে কি সেভাবে দেখা যায়, বল? হ্যাঁ, বলতে পার এটা এক ধরনের আদর্শবাদ।

পোলিনা : হ্যাঁ তোমার এই আদর্শের আকর্ষণেই মেয়েরা পঙ্গপালের মতো ছুটে আসে। তোমার প্রেমে পড়ে।

ডোরন : মেয়েদের সাথে সম্পর্কের কথা উঠলেই তোমরা একটা বিশেষ দিকে ইঙ্গিত কর। কিন্তু সত্যি কথা হল মেয়েদের সাথে আমার সম্পর্কের মধ্যে বেশির ভাগ ভালোই ছিল, যাকে বলে পবিত্র। ডাক্তার হিসেবে আমার দক্ষতার জন্যই ওরা আমাকে বেশি পছন্দ করত। ভেবে দেখ, আজ থেকে দশ-পনের বছর আগে ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী আমি ছাড়া আর কি কেউ ছিল? তাছাড়া আমি সারাজীবনই মানুষের সাথে সৎ থেকেছি।

পোলিনা : [ডোরনের বাহু ধরে] সে জন্যই তো তুমি আমার...।

ডোরন : এই চুপ। ওরা আসছে।

[সোরিনের বাহুলগ্না মাদাম আরকাডিনা, ট্রিগোরিন, সামারায়েভ, মেদভাদেনকো ও মাশা প্রবেশ করে।]

সামারায়েভ : মনে পড়ে '৭৩-এর পোলতারা মেলায় তাঁকে দেখেছিলাম। একেই বলে অভিনেত্রী।—সে কী অভিনয়! অবিশ্বাস্য! নির্ভেজাল আনন্দঘন ঘটনা। অদ্ভুত! ওহ্? ভালো কথা, শাদিনকে কি আপনি চেনেন? তার সাথে কি দেখা হয়—? শাদিন, প্যাভেল সামিওনিচ শাদিন, কৌতুক অভিনেতা। রাওপ্লাইয়েভ-এর ভূমিকায় সে অতুলনীয়। সাদোভস্কির চেয়েও ভালো। এখন কোথায় আছেন জানেন?

আইরিনা : [বিরক্ত হয়] তুমি তো দেখি সব ফসিলগুলোর খোঁজখবর করছ। কে কোথায় আছে তার আমি কী জানি। [বসে]

সামারায়েভ : হায় পাশকা শাদিন! এখন আর তার মতো অভিনেতাই নেই। ম্যাডাম, আসলে থিয়েটারের অবনতিই হচ্ছে। ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে। কোথায় অতীতের সেই সুবিশাল পল্লবিত বৃক্ষ! এখন শুধু অর্থহীন কাণ্ডই পড়ে আছে।

ডোরন : ঠিক বলেছেন। সে ধরনের সুদক্ষ সুনিপুণ অভিনেতা-অভিনেত্রী আজ আর তেমন নেই সত্য, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখুন, আজকাল গড়পড়তায় অভিনেতারা অনেক বেশি দক্ষ ও নিপুণ—বেশি জানে। সবদিক বিচার করলে এখনকার অভিনয়ের ধারা অনেক উন্নত।

সামারায়েভ : আপনার সাথে আমি ঠিক একমত হতে পারলাম না। অবশ্য ব্যক্তিগত মতভেদের ব্যাপারে তো আর কিছু করার নেই। [মঞ্চের ভিতর দিক থেকে বেরিয়ে আসে ত্রেপলেভ]

আইরিনা : [ত্রেপলেভকে] কী হল, কখন শুরু করবে?

ত্রেপলেভ : এই দু-এক মিনিটের মধ্যেই শুধু করব। একটু অপেক্ষা কর মা।

আইরিনা : [হ্যামলেট থেকে পড়ে]

'Oh, Hamlet speak no more!
Thou turnest mine eyes into my very soul;
And there I see such black and grained spots
As will not leave their tinct.,

ত্রেপলেভ : [হ্যামলেট থেকে পড়ে]

And let me wring thy heart', for so I shall
If it be made of penetrable stuft

[নেপথ্যে ভেঁপু বেজে ওঠে] ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, শুরু করছি আমাদের নাটক। আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। নাটক

শুরু হচ্ছে। [মঞ্চের পাটাতনে হাতের লাঠি ঠুকতে ঠুকতে সজোরে আবৃত্তি] হে বিগত দিনের সুপ্রাচীন স্মৃতি, নিশীথের অন্ধকারে দিঘির জলে হে ভাসমান ছায়া, তোমরা আমাদের ধীরে ধীরে ঘুম পাড়িয়ে দাও। অনাগত দুই শ হাজার বছরের স্বপ্ন নিয়ে এস আমাদের চোখে।

সোরিন : দুই শ হাজার বছরে কি থাকবে কিছু? কিছুই না।

ত্রেপলেভ : সেই 'কিছুই না'কেই অভিনয় করে দেখানো হবে।

আইরিনা : ঠিক আছে, তাই কর। তবে এর মাঝেই কিন্তু সবার ঘুম ঘুম ভাব হয়েছে।

[পর্দা ওঠার সাথে সাথে দেখা যায় পেছনে খোলা দিগন্তে চাঁদ উঠছে। দিঘির জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদের চূর্ণবিচূর্ণ ঝিকিমিকি।]

নীনা : [ধপধপে সাদা পোশাকে। একটি প্রকাণ্ড পাথরের উপর বসে আছে।] সকল মানুষ, তিতির, হরিণ, সিংহ, ঈগল, রাজহাঁসের দল চলে গেছে। চলে গেছে তারামাছ ও অতলান্ত সাগরের সব নীরব মাছেরা, মাকড়সা এবং অদৃশ্যপ্রায় সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী। চলমান সব জীবন্ত বস্তু, সব, সকলেই তাদের দুঃখের পালা সম্পূর্ণ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তারপর সহস্র সহস্র বছর আর কোনো জীবন্ত কিছু প্রসব করেনি এই ধরিত্রী। তবু, তবু ঐ একা অসহায় চাঁদ অর্থহীন আলো ছড়ায়। কোথাও কোনো খোলা মাঠে সহসা কোনো সারস আর ডেকে ওঠে না। গুব্‌রে পোকাদের একটানা শব্দ এখন আর নেই কোনো বাতাবিলেবুর ঝোপে। সবকিছু ঠাণ্ডা, শীতল, সবকিছুই ভয়ঙ্কর পরিত্যক্ত। এক কালের জীবন্ত চলমান প্রাণীরা এখন শুধু ধুলো। সর্বকালজয়ী 'শক্তি' তাদের সবাইকে রূপান্তরিত করেছে পাথরে, পানিতে এবং মেঘে। সকল জীবাত্মা একটি মাত্র আত্মার মাঝে বিলীন হয়ে গেছে। সেই একীভূত আত্মাই হলাম 'আমি।' আমি। আমার মাঝেই আলেকজান্ডার, সিজার, শেকসপিয়র, নেপোলিয়ন থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর কীটের আত্মাও বিলীন হয়েছে। আমার মাঝেই একাকার হয়ে গেছে মানুষের চেতনা আর পশুর সহজাত প্রবৃত্তি। আমি ভুলিনি কিছুই, কিছুই, কিছুই। মনে আছে সব, সব, সব। আমার মাঝেই আবার নতুন করে বাঁচবে প্রতিটি একক প্রাণী।

[আলেয়ার আবির্ভাব]

আইরিনা : [চাপা গলায়] এগুলো সব ঐ বিলুপ্ত সিম্বলিস্টদের কাজ।

ত্রেপলেভ : [মিনতি ও ভর্ৎসনার সুরে] আহ মা!

নীনা : আমি একা। শত বছরে আমি শুধু একবার কথা বলি। আমার কণ্ঠস্বর শুধু এই জীবশূন্য ধরিত্রীর বুকে শোকাতুর প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে ফিরে আসে। কেউ শোনে না। তুমি! এই যে আলেয়া, বিবর্ণ আত্মা! তুমিও শুনতে পাও না। অন্ধকার রাতের জলাভূমিতে তোমার জন্ম। সূর্য ওঠার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে বেড়াও, অসাড়, কোনো বোধ নেই, কোনো ইচ্ছা নেই, নেই এতটুকু জীবনের স্পন্দন। শাশ্বত বস্তুর যিনি একমাত্র অধিকর্তা সেই আঁধারের রাজপুত্রের আশঙ্কা তোমার মাঝ থেকেই আবার জীবনের সঞ্চার হবে এবং সে জন্যেই পাথর ও পানির মতো তোমার মাঝেও অণুর সৃষ্টি করেছেন, যাতে চির প্রবহমান ও নিরন্তর গতিশীল হয় তোমার অস্তিত্ব। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরমাত্মাই শুধু অপরিবর্তিত থাকে। [থামে] গভীর শূন্য কূপে প্রবিষ্ট কয়েদির মতো আমি জানি না, আমি কে, আমার পেছনে কী, সামনেই-বা কী আছে। শুধু এতটুকুই জানি, নির্ধারিত নিয়তি আমার, অন্ধকারের রাজপুত্রের সাথে অবিরাম লড়াই। এবং সেই নিষ্ঠুর তিক্ত যুদ্ধে শাশ্বত বস্তুশক্তিকে সমূলে বিনাশ করে অবশ্যই আমি বিজয়ের মুকুট পরব। তখনই কেবল শাশ্বত জড়বস্তু পরমাত্মার সাথে একত্রিত হবে বিজয়োল্লাসে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে সৃষ্টির স্বাধীন সাম্রাজ্য। তবে এর কোনো কিছুই রাতারাতি হবে না। অসংখ্য সহস্র বছরের পথ ধরে ধীরে ধীরে পাবে পূর্ণতা। তখন চাঁদ, উজ্জ্বল লুব্ধক নক্ষত্র এবং এই পৃথিবী কিছুই থাকবে না। সবই ধুলায় রূপান্তরিত হবে। তখন পর্যন্ত শুধু বিভীষিকা, শুধুই বিভীষিকা। [থামে। দুটো লাল স্পট লেকের সামনে ভেসে ওঠে।] ঐ যে অদম্য শক্তিশালী আমার প্রতিপক্ষ অন্ধকারের রাজপুত্র এদিকে আসছে। আমি দেখতে পাচ্ছি তার দুটো রক্তাভ ভয়ঙ্কর চোখ। দেখতে পাচ্ছি ঠিক।

আইরিনা : সালফারের গন্ধ না?

ত্রেপলেভ : হ্যাঁ।

আইরিনা : এফেক্টটা কিন্তু ভালো এসেছে, সুন্দর।

ত্রেপলেভ : মা!

নীনা : তার কোনো অস্তিত্বই নেই। মানুষ ছাড়া...

পোলিনা : [ডোরনকে] ও কী! আবার হ্যাট খুলেছ? না—তুমি ঠাণ্ডা না লাগিয়ে ছাড়বে না। নাও, পরো, পরে ফেল।

আইরিনা : ডাক্তার শাশ্বত বস্তুর সর্বময় অধিকর্তা অন্ধকারের রাজপুত্রের উদ্দেশে হ্যাট উঠিয়েছেন।

ত্রেপলেভ : ব্যস, হয়েছে। অনেক হয়েছে। নাটক বন্ধ কর। বন্ধ কর। পর্দা ফেলে দাও।

আইরিনা : কী হল? তুমি অমন খেপে যাচ্ছ কেন?

ত্রেপলেভ : যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে। আমি বলছি যথেষ্ট হয়েছে। দাও, পর্দা টেনে দাও। [মাটিতে পা মাড়িয়ে] পর্দা ফেল—পর্দা—পর্দা ফেলে দাও। [পর্দা পড়ে]

ভদ্রমহোদয়গণ, ক্ষমা করবেন, আমি আমার সীমা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার মনে ছিল না যে সমাজের উঁচুশ্রেণীর মানুষেরাই শুধু নাটক লিখতে ও তাতে অভিনয় করার সমস্ত অধিকার সংরক্ষণ করেন। তাদের এই একচেটিয়া অধিকারে নাক গলিয়ে আমি অন্যায় করেছি। মানে—আমি বলতে চাই। [বলতে চেয়ে পারে না। হাত নেড়ে বেরিয়ে যায়।]

আইরিনা : কী হল ওর? অমন করল কেন?

সোরিন : আইরিনা, তারুণ্যের আত্মাভিমান। ওর প্রতি তোমার একটু শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

আইরিনা : কিন্তু, আমি তো কিছু বলিনি।

সোরিন : তুমি তার কোমল অনুভূতিকে আঘাত করেছ।

আইরিনা : ও বলল পুরো ব্যাপারটাই কৌতুকের মতো, আমি তো সেভাবেই নিয়েছি।

সোরিন : সে হয়তো বলেছে কৌতুক কিন্তু তোমার কৌতুক ভাবা ঠিক হয়নি।

আইরিনা : যে ভাবে আচরণ করল তাতে তো মনে হল—ও একটা মাস্টারপিস লিখেছে। ভেবে দেখ, শুধু কৌতুক করতে ও এ নাটক লেখেনি—সালফার পুড়িয়ে বাতাস ভারী করেছে শুধু এমনিতে নয়—তার নির্ঘাত কোনো উদ্দেশ্য ছিল। পরোক্ষভাবে আমাদের শেখাচ্ছিল নাটক কীভাবে লিখতে হয়—কোন ধরনের নাটকে অভিনয় করতে হয়, কী ধৃষ্টতা দেখ, এসব ও আমাদের শেখাতে চায়। নাহ, দিন দিন অসহ্য হয়ে যাচ্ছে, এ ধরনের আক্রমণাত্মক খোঁচা, আমার ধৈর্য—আরে আমি তো দূরের কথা, ধ্যানমগ্ন তপস্বীর পর্যন্ত ধ্যান ভেঙে যাবে। আশ্চর্য! না, সোরিন, এটা তোমাকে মানতেই হবে, কোস্টিয়া অর্থহীনভাবে অহংকারী দাম্ভিক হয়ে গেছে।

সোরিন : কিন্তু, ও তো তোমাকে খুশি করার জন্য এ সব কিছু করছে।

আইরিনা : তাই? তা তো ভালো, কিন্তু ও তো কোনো যেনতেন ধরনের নাটক বাছেনি। কতকগুলো আবেগপূর্ণ উল্টোপাল্টা উক্তি শুনতে আমাদের বাধ্য করেছে। ঠাট্টা-তামাশা হলে পাগলের

পাগলামিতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এ তো সে রকম কিছু নয়। ভণ্ডামি আর কি! শিল্পের নতুন ফরম, সৃজনশীলতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন। যত্তসব! ঐ সব নতুন ফরম-টরম যাই বল আমার কাছে নিরেট বেয়াদবি ছাড়া কিছু না।

ট্রিগোরিন : লেখকের কাজই তো নিজের চিন্তা প্রকাশ করা। প্রকাশটা যাতে ভালো হয় সে চেষ্টা অবশ্য করতে হয়।

আইরিনা : ও যা ভালো মনে করে তাই লিখুক-না কেন, তাতে আমার কি কোনো আপত্তি আছে? কিন্তু এসব নিয়ে আমাকে বিরক্ত করবে কেন? এটা তো আমি চাই না।

ডোরন : আরে জুপিটার, আপনি কিন্তু রেগে যাচ্ছেন।

আইরিনা : দেখুন, আমি জুপিটার নই। একজন মহিলা। [সিগারেট ধরায়] রাগছি না, রাগ করব কেন? আমার ছেলে তার মূল্যবান সময় অর্থহীন নাটক করে নষ্ট করছে এটাই আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি তার আত্মাভিমান বা অনুভূতি কোনোটাতেই আঘাত করতে চাইনি।

মেদভাদেনকো : জড়বস্তু এবং আত্মার মধ্যে পার্থক্য দেখাবার এমন কোনো মৌলিক ভিত্তি নেই। আত্মা কতকগুলো অণুর সমষ্টি ছাড়া তো কিছু নয়। [ট্রিগোরিনকে উত্তেজিতভাবে] নাট্যকারদের অবশ্যই একটি সামাজিক দায়িত্ব আছে। শিক্ষকরা কীভাবে মানবেতর জীবন যাপন করছে এ নিয়ে তাদের লেখা উচিত এবং যত বেশি সম্ভব সে নাটক মঞ্চস্থ হওয়া উচিত। আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন, আমরা শিক্ষকরা কী সাংঘাতিক কঠিন জীবন যাপন করছি।

আইরিনা : তা সত্য। কিন্তু এখন থাক। তোমার ঐ শিক্ষক, অণু অথবা নাটক সম্পর্কে পরে আলাপ করা যাবে। আহা! দেখছ-না কী সুন্দর সন্ধ্যা। এই চুপ—শোন—শোন [শোনার ভঙ্গি] ঐ গান শুনতে পাচ্ছ। [সবাই শোনে]

পোলিনা : লেকের ওপারে গান হচ্ছে। [থামে]

আইরিনা : [ট্রিগোরিনকে] এস এইখানে আমার পাশে বস। দশ-পনের বছর আগে এখানে প্রায় প্রতি রাতেই গান শোনা যেত। এই লেকের পাড়ে ছয়টা তালুক আছে। হায়রে! মনে পড়ে, সে কী আনন্দ উল্লাস! মানুষের উচ্ছলতা। কত কত লোক যে শিকারে আসত। চারদিকে তখন প্রেম-ভালোবাসার জোয়ার। চারদিকে, প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে। আর সে-সব ভালোবাসার খেলায় মধ্যমণি ছিল আমাদের এই বন্ধু—[ডোরনের দিকে ফিরে] ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু, আমি ডা. ইয়েভজিনি সারগেইভিচকে পরিচয় করিয়ে

দিচ্ছি। এখনো সে প্রাণবন্ত, সুন্দর আর ফুর্তিবাজ মানুষ। কিন্তু সে-সব দিনে তার জুড়ি ছিল না। অতুলনীয়! আশ্চর্য! কিন্তু আমার এ রকম কেন হচ্ছে? আমার বিবেক...কী দরকার ছিল! কেন তার কোমল অনুভূতিকে আঘাত করলাম। না, কিছু ভালো লাগছে না। [ডাক দেয়] কোস্টিয়া, কোস্টিয়া, কোস্টিয়া।

মাশা : আমি দেখছি—

আইরিনা : হ্যাঁ, একটু দেখ না।

মাশা : [ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে যায়] কনস্টানটিন গাভরিলোভিচ—গাভরিলোভিচ—কনস্টানটিন।

নীনা : [মঞ্চের পিছন থেকে বেরিয়ে আসে] মনে হচ্ছে নাটক আর হবে না। তার চেয়ে আপনাদের সাথে বসে একটু আলাপ করি। আপনারা সবাই ভালো তো? [আইরিনা ও পোলিনাকে চুমু খায়]

সোরিন : শাবাশ—শাবাশ মেয়ে।

আইরিনা : সত্যি। দারুণ ভালো লাগল। তোমার মতো মেয়ের এই পাড়াগাঁয়ে থাকাটা কোনোমতেই উচিত না। যেমন চেহারা তেমনি কণ্ঠ। তোমার প্রতিভা আছে। প্রতিভা নষ্ট করা পাপ, বুঝলে? একজন বড় মাপের অভিনেত্রী হবার সব ক্ষমতাই তোমার আছে।

নীনা : সেই তো আমার একমাত্র স্বপ্ন [দীর্ঘশ্বাস], কিন্তু জানি, সে স্বপ্ন কোনোদিন সত্য হবে না। স্বপ্নই থেকে যাবে।

আইরিনা : সে কি কেউ বলতে পারে? ওহ্—ট্রিগোরিনের সাথে তোমার আলাপ করিয়ে দিই? বোরিস আলেকসেইভিচ ট্রিগোরিন।

নীনা : [ট্রিগোরিনের দিকে তাকিয়ে] খুশি হলাম। আপনার লেখা আমার খুব ভালো লাগে। প্রায় সবগুলোই পড়েছি।

আইরিনা : [নীনাকে] এই—এই দেখ, লজ্জা পাবার কী আছে? ট্রিগোরিন কিন্তু সত্যি বিখ্যাত লোক। নম্র, ভদ্র। পুরুষমানুষ হলে কী হবে, ভীষণ লাজুক। দেখ-না নিজেই কেমন লজ্জা পাচ্ছে।

ডোরন : কী মনে হয়? পর্দাটা আর একবার ওঠানো যায় না? এই অবস্থায় একটা দারুণ ইফেক্ট আসবে।

সামারায়েভ : ইয়াকোভ, পর্দা ওঠাও। ওঠাও না।

[পর্দা আবার উঠে যায়]

নীনা : [ট্রিগোরিনকে] কেমন একটা অদ্ভুত নাটক তাই না!

ট্রিগোরিন : একটা শব্দও বুঝিনি। তবে ভালো লেগেছে। আপনি বেশ নিষ্ঠার সাথেই অভিনয় করলেন। দৃশ্যগুলো সুন্দর। আচ্ছা, পেছনের ঐ লেকে অনেক মাছ আছে, তাই না?

নীনা : হ্যাঁ, তা আছে।

ট্রিগোরিন : মাছ ধরা আমার এক নেশা। অবশ্য সন্ধ্যার দিকে লেক অথবা নদীর নির্জন পাড়ে বসে মাছ ধরা ছাড়া আর কিছু করারও থাকে না।

নীনা : অদ্ভুত তো! যে লোক সত্যিকার অর্থে সৃজনশীল কাজে অভিজ্ঞ সে মাছ ধরার মতো ব্যাপারে কীভাবে আনন্দ পায় ঠিক বুঝতে পারছি না।

আইরিনা : চুপ—চুপ, এই মেয়ে ওর সাথে ওভাবে কথা বললে বেচারা উত্তরই দিতে পারবে না।

সামারায়েভ : মনে আছে, একরাতে মস্কোতে এক অপেরায় গেলাম। সেই যে বিখ্যাত সিলভা, মনে পড়ে। সিলভা 'সি' স্কেলে ধরেছে। ঘটনাচক্রে আমাদের চার্চ কয়ারের অন্যতম 'বেস' ছিল গ্যালারিতে। হঠাৎ সবাই চমকে উঠে শুনলাম গ্যালারি থেকে কে একজন বলছে 'শাবাশ সিলভা।' একেবারে উদারার খাদে। [গলা খাদে নামিয়ে] 'শাবাশ সিলভা।' সেই পিনপতন নিস্তব্ধতার মাঝে—অমন খাদে, ভেবে দেখুন। লোকজন একেবারে থ'। নিঃশব্দ।

[নীরবতা]

ডোরন : নিস্তব্ধতার দেবী আমাদের ওপর ভর করেছে।

নীনা : আমি এবার উঠব। সবাইকে বিদায়—

আইরিনা : কী বলছ? এত তাড়াতাড়ি কোথায়? আরো কিছুক্ষণ বস—

নীনা : না, না, বাবার অবস্থা এতক্ষণে—

আইরিনা : তোমার বাবা যেন কেমন লোক। [জড়িয়ে ধরে] ঠিক আছে, যেতেই যদি হয় তো যাও—কিন্তু এত সকালে ছাড়তে চেয়েছিলাম না।

নীনা : কী করব? যেতে হচ্ছে বলে আমারও খারাপ লাগছে।

আইরিনা : কেউ একজন তো তোমার সাথে যাওয়া উচিত। একা যাওয়া ঠিক হবে না।

নীনা : [একটু ভয় পেয়ে] না। না। প্রয়োজন নেই।

সোরিন : [নীনাকে] আর একটু থাক না।

নীনা : সত্যি বলছি, একদম সম্ভব নয়।

সোরিন : মাত্র এক ঘণ্টা। তারপর চলে যেও।

নীনা : [একটু চিন্তা করে] না, না, সত্যি বলছি সম্ভব নয়। [সোরিনের সাথে হাত মিলিয়ে চলে যায়]

আইরিনা : আহা! বড় দুর্ভাগ্য মেয়েটির। সবাই বলাবলি করছে ওর মা মারা যাবার সময় সবকিছু রেখে গেছে ওর বাবার কাছে। সব কিছু।

যা তার ছিল। ছিলও প্রচুর। কিন্তু তাহলে কী হবে—ওর কিছু নেই। ওর বাবা আবার বিয়ে করেছে—যা কিছু ছিল সৎমা হাতিয়ে নিয়েছে—ভেবে দেখ, সব আছে কিন্তু কিছু নেই। আহা বেচারি!

ডোরন : সত্যিই ওরা বাপটা একটা পশু, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

সোরিন : [একটু উষ্ণতার জন্য হাতে হাত ঘষে] এ জায়গাটা কেমন ভেজা ভেজা। চল, ভেতরে যাই সবাই। এর মধ্যেই আমার পা চিবোতে শুরু করেছে।

আইরিনা : হায় হায়, পা নিয়ে যে তোমার কী হবে! কাঠির মতো দুটি পা। হাঁটতেই তো পারছ না। চল, ওঠ, আমি ধরি, চল।
[সোরিনের হাত ধরে ওঠায়]

সামারায়েভ : [তার স্ত্রীর দিকে হাত বাড়িয়ে] মাদাম!

সোরিন : কুকুরগুলো আবার ডাকছে। [সামারায়েভকে] ইলিয়া আফানাসায়েভিচ কুকুরগুলোর চেইন খুলে দেয়া যায় না?

সামারায়েভ : অসম্ভব পিওতর নিকোলায়েভিচ! সবেমাত্র গোলায় শস্য উঠিয়েছি। এখনই তো চোরের উৎপাত শুরু হবে। [মেদভাদেনকোকে] ভেবে দেখ, পুরো উদারার খাদে। শাবাশ সিলভা। আসলে সে কিন্তু তেমন কোনো গায়ক ছিল না—কয়ারে গলা মেলাত শুধু।

মেদভাদেনকো : কয়ারে গলা মেলালে কত দেয়?
[ডোরন ছাড়া সবাই চলে যায় ভেতরে]

ডোরন : [একা একা] জানি না। এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। হতে পারে আমার কিছুটা পাগলামো আছে; তবে নাটকটা আমার বেশ ভালো লেগেছে। এর মাঝে কিছু একটা নির্ঘাত আছে। মেয়েটা যখন একাকিত্বের কথা বলছিল আর রক্তচক্ষুর আবির্ভাব হয়েছিল তখন আমার হাত দস্তুরমতো কাঁপছিল। এ নাটকে নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে বিশুদ্ধ, ভড়ংশূন্য। হ্যাঁ, ঐ যে ত্রেপলেভ আসছে। তাকে অবশ্যই প্রশংসা করা উচিত।

ত্রেপলেভ : এর মাঝেই সব চলে গেল?

ডোরন : আমি তো আছি।

ত্রেপলেভ : মাশা আমাকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে যাচ্ছে। ওকে আমার সহ্যই হয় না।

ডোরন : কোস্টিয়া, তোমার নাটক আমার কিন্তু দারুণ ভালো লেগেছে। যদিও সবটুকুও শুনতে পারিনি তবু যতটুকু শুনেছি সেটুকুই আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। অদ্ভুত সুন্দর নাটক

তোমার। তুমি প্রতিভাবান, লেখা থামিও না, চালিয়ে যাও। [ত্রেপলেভ ডোরনের হাতে হাত মেলায় এবং তাকে সবেগে জড়িয়ে ধরে] এখনকার মতো এতটুকুই থাক। তোমার দোষ হল বড় বেশি ঘাবড়ে যাও। আরে, এই যে আবার চোখে জল। আমি জানি তুমি নির্বস্তুক মানে বিমূর্ত ভাব নিয়ে কাজ করছ, এটা ভালো এবং এই তো হওয়া উচিত। শিল্পকর্ম মাত্রেই একটা মহৎ কোনো ভাবনা প্রকাশ করতে চায়, তা না হলে উদ্দেশ্য অর্থহীন হয়ে যায়। যা গভীর কিছু ধারণ ও প্রকাশ করতে পারে সেই তো সত্যিকার অর্থে সুন্দর। তোমাকে অমন লাগছে কেন? কেমন ফ্যাকাসে। কী হয়েছে?

ত্রেপলেভ : তাহলে আপনি বলছেন আমার লিখে যাওয়া উচিত।

ডোরন : অবশ্যই। অবশ্যই তোমার লেখা উচিত। তবে তোমার সব সময়ই কিছুটা গভীর বিষয় বেছে নেওয়া উচিত। তুমি জান, আমি একটা পরিপূর্ণ জীবন যাপন করেছি। প্রচুর অভিজ্ঞতা। বলতে গেলে আমার জীবনের প্রায় সবটুকুই উপভোগ করেছি। এখন আমি পরিতৃপ্ত। তবু একজন শিল্পীর সৃষ্টির মুহূর্তে যে আনন্দ তা যদি ক্ষণিকের জন্যেও উপলব্ধি করতে পারতাম, তাহলে আমার সব রকম শারীরিক আনন্দানুভূতিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারতাম। অনাবিল আনন্দে উড়ে উড়ে বেড়াতে পারতাম।

ত্রেপলেভ : ক্ষমা করবেন, নীনা কোথায় জানেন?

ডোরন : আর একটা ব্যাপার খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পকর্ম সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট এবং পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে—তুমি কেন লিখছ এটা তোমাকে স্পষ্ট করে জানতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট ধারণা না নিয়ে যদি এই মোহন রাজপথে উদ্‌ভ্রান্তের মতো হেঁটে বেড়াও তাহলে পথ তুমি হারাবেই। সে ক্ষেত্রে তোমার প্রতিভাই তোমাকে বিনাশ করবে।

ত্রেপলেভ : [অধৈর্য হয়ে] নীনা কোথায় জানেন?

ডোরন : বাড়ি চলে গেছে।

ত্রেপলেভ : তাহলে আমি কী করব? তাঁকে যে আমার খুব প্রয়োজন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাই।

[মাশা প্রবেশ করে]

ডোরন : আহা বাপু, এক পলক একটু শান্ত হয়ে বস না।

ত্রেপলেভ : না, বসার উপায় নেই। আমাকে যেতেই হবে।

মাশা : কোস্টিয়া, একটু ভিতরে এস। তোমার মা খুব অস্থির। তোমাকে খুঁজছেন।

ত্রেপলেভ : তাকে বল, আমি চলে যাচ্ছি। আর শোন মাশা, দয়া করে আমাকে একটু একা থাকতে দাও। তোমাদের হাতজোড় করে বলছি, আমাকে খুঁজো-না। একটু একা থাকতে দাও।

ডোরন : ও কী! তুমি অমন করছ কেন? না না, এত ঠিক নয়।

ত্রেপলেভ : [প্রায় কাঁদো কাঁদো] আমি আসি ডাক্তার।
[চলে যায়]

ডোরন : হায় তারুণ্য! চিরদিন একগুঁয়ে আপন পথেই চললে।

মাশা : মানুষ যখন বুঝতে পারে না কী বলা উচিত তখনই বলে হায় তারুণ্য! [এক টিপ নস্যি নেয়]

ডোরন : [মাশার হাত থেকে নস্যির কৌটা কেড়ে নিয়ে ঝোপের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেয়] বিচ্ছিরি। [থামে] মনে হয় ভিতরে গান হচ্ছে, চল, ভিতরে যাই।

মাশা : দাঁড়ান! এক মিনিট।

ডোরন : কেন, তোমার আবার কী হল?

মাশা : আপনাকে আমার কিছু কথা বলার আছে। বলা প্রয়োজনই। [মন-মরা] আমি আমার বাবাকে পছন্দ করি না। আপনাকে আমার বাবার চেয়েও বেশি মনে করি। কিছু কারণে আপনাকে আমার দারুণ আপন মনে হয়। সে জন্যেই বলছি, আপনিই বরং আমাকে একটু সাহায্য করুন। নাহলে আমি হয়তো নির্বোধের মতো এমন কিছু করে বসব যেটা জীবনকে বিদ্রূপ করবে, বিনাশ করবে। এভাবে তো আর চলতে পারে না।

ডোরন : কিন্তু ব্যাপারটা কী? সাহায্য করতে হবে সে না-হয় বুঝলাম, কিন্তু কেন করতে হবে সেটা না বললে কী বুঝব?

মাশা : আমারই দুর্ভাগ্য। এ দুর্ভাগ্যের কথা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। [ডোরনের শরীরে এলিয়ে পড়ে] কোস্টিয়াকে আমি ভালোবাসি।

ডোরন : আশ্চর্য! কেমন গোলমেলে ব্যাপার দেখ তো! এখানে সবাই মনে হয় প্রেমে পড়েছে। নাহ এই লেকে নির্ঘাত জাদু আছে। [শান্তভাবে] কিন্তু আমি কী করতে পারি বল। বল আমাকে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[সোরিনের বাগানবাড়ির একটি লন। ডান দিকে ব্যাকগ্রাউন্ডে আঙিনাসহ একটি প্রকাণ্ড ঘর। বাঁ দিকে সূর্যালোকে প্রতিবিম্বিত লেক দেখা যায়। দুপুরবেলা, বেশ গরম পড়েছে। আইরিনা, ডোরন ও মাশা লনের একপাশে বড় একটি বাতাবিলেবু গাছের নিচে বসে আছে। ডোরনের কোলের উপর একটি খোলা বই।]

আইরিনা : মাশা, এস এদিকে। দেখি, এখানে আমার পাশে দাঁড়াও দেখি। এইখানে, হ্যাঁ এস দুজনে পাশাপাশি দাঁড়াই। তোমার বয়স মাত্র বাইশ আর আমি তোমার প্রায় দ্বিগুণ। এই যে ডাক্তার দেখ তো আমাদের দুজনের কাকে ছোট মনে হয়?

ডোরন : অবশ্যই আপনাকে।

আইরিনা : [মাশাকে] তাহলেই দেখ। কিন্তু কেন ছোট লাগছে জান? আমি শুধু বসে থাকি না, কাজ করি। এক সাথে অনেক কিছুর সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখি। সব সময়ই একটা গতির মধ্যে থাকি। আর তুমি! নিথর, নিস্তব্ধ। কোনো গতি নেই। গতি নেই মানে জীবন নেই! আমি ভবিষ্যৎ, আগামী-টাগামী বুঝি না। ওসব নিয়ে ভাবিও না। ভেবে কী হবে। যা হবার তা তো হবেই।

মাশা : কিন্তু আমার মনে হয়, আমি যেন হাজার বছর পার করে জীবনটাকে কোনোভাবে পেছনে টেনে চলেছি। জীবনটা যেন একটা পোশাকের মতো। আমার পেছনে সেটা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় এভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই। অবশ্য জানি এ সব কথাও অর্থহীন। তবে এ কথা সত্যি যে মনের এই অবস্থা বেশি দিন থাকবে না। এটা দূর হয়ে যাবে।

ডোরন : [গুনগুন করে] 'বল তারে সুন্দরী ফুল'...

আইরিনা : আর একটা কথা তোমাকে বলি, আমার চেহারার ব্যাপারে কিন্তু আমি দারুণ সজাগ। নিজেকে কখনো শেষ হতে দিও না। দেখ না, সব সময়ই আমি কাপড়চোপড় বেছে বেছে পরি, হাল ফ্যাশনে চুল বাঁধি। তুমি কি মনে কর ড্রেসিং গাউন পরে বা চুল

না বেঁধে আমি কখনো বাইরে যাব? কখ্খনো না, এমনকি বাগানেও না। এই এত বয়সেও আমি তরুণী, সে কি এমনিতেই? বেশির ভাগ মেয়েদের মতো আমি কোনোদিন এলোমেলো থাকিনি বা নিজেকে ভাসিয়ে দিইনি। সে কারণে আজো আমাকে তোমার চেয়ে ছোট মনে হয়। [লনে পায়চারি করতে করতে নিজের নিতম্বে হাত রেখে] দেখ, এখনো আমি পাখির মতো হালকা গতিতে উড়ে বেড়াতে পারি। আর চাইলে আগামীকালই পনের বছরের মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারি—একটুও বেমানান মনে হবে না।

ডোরন : আচ্ছা—তাহলে আমি এবার পড়া শুরু করি। [বইটা উঠিয়ে নেয়] আমরা আড়তদার ও ইঁদুরের জায়গাটায় এসে থেমেছিলাম।...

আইরিনা : ও হ্যাঁ, ইঁদুর। ঠিক আছে, শুরু কর। না না, একটু দাঁড়াও। আমি পড়ি। এবার তো আমার পালা [বই নিয়ে শুরু করার জায়গা খুঁজতে থাকে] ইঁদুরগুলো...হ্যাঁ, এখান থেকে...[পড়া শুরু করে] 'আড়তদার বা শস্য ব্যবসায়ীদের পক্ষে নিজেদের গোলায় ইঁদুর প্রজনন বা লালন-পালন যেমন বিপজ্জনক তেমনি বিপজ্জনক সমাজপতিদের পক্ষে ঔপন্যাসিক লালন-পালন করা। অবশ্য ঔপন্যাসিকদের ভক্তের সংখ্যা প্রচুর, মানুষ তাঁদের খুঁজে বেড়ায়। কখনো যদি কোনো মহিলা কোনো লেখককে বাগে আনার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তাকে বেছে বেছে কথা শোনায়, নানারকম ছলনা-অনুগ্রহ দিয়ে ভোলায়।' এটা অবশ্য ফরাসিদের বেলায়ই খাটে। এখানে তেমন কিছু নেই। আমরা কোনো পরিকল্পনা করি না অথবা দেখেও না-দেখার ভান করি না। এখানে কেউ কোনো লেখককে ভালোবাসছে তো একেবারে হাবুডুবু, কোনো পরিকল্পনা বা বাগে আনার জন্য নয়, ভালোবেসেছে বলেই, ব্যস। এটা অবশ্য অনেকেই জানে, ট্রিগোরিন আর আমার কথাটাই ধর না! [সোরিন লাঠিতে ভর দিয়ে প্রবেশ করে, পাশে নীনা, মেদভাদেনকো একটি খালি হুইল চেয়ার টানতে টানতে ওদের পেছনে প্রবেশ করে।]

সোরিন : [যেন কোনো বাচ্চাকে আদর করে বলছে] তাহলে আজ আমরা সবাই খুব খুশি। শেষ পর্যন্ত একটা আনন্দঘন পরিবেশ পাওয়া গেল। আনন্দ কেন, জানো? আমাদের সৎমা আর বাবা ভারে বেড়াতে গেছেন। তিন দিনের জন্য পূর্ণ মুক্তি।

নীনা : [আইরিনার পাশে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে] সত্যি আমার খুব ভালো লাগছে। তিন দিন তো আপনাদের সাথে থাকতে পারব।

সোরিন : [হুইল চেয়ারে বসে পড়ে] দারুণ সুন্দর লাগছে কিন্তু তোমাকে [আইরিনাকে] তাই না?

আইরিনা : বাহ্—সুন্দর সেজেছ। একেবারে ঝলমল করছে। তুমি সত্যি অপূর্ব মেয়ে—[চুমু খায়] তবে সামনাসামনি অতটা প্রশংসা করা ঠিক নয়। এতে দুর্ভাগ্য আসে। বরিস আলেকসেইভিচ কোথায় গেলেন?

নীনা : লেকের ওদিকটায় দেখলাম, মাছ ধরছেন।

আইরিনা : ঐ ব্যাপারে লোকটির কোনো অরুচি নেই। [আবার পড়তে শুরু করে]

নীনা : কী পড়ছেন?

আইরিনা : মোপাসাঁর 'জলে', [মনে মনে কয়েক লাইন পড়ে] আচ্ছা, এ জায়গাটুকু তেমন মজার না, এটা বাদ দিয়েই যাই। তাছাড়া এটা সত্যও নয়। [বই বন্ধ করে] আচ্ছা, তোমরা কি কেউ জানো কোস্টিয়ার কী হয়েছে? আমি বুঝি না ও অত মনমরা, ভার ভার কেন, কী হয়েছে? আমার সাথে তেমন দেখাও হয় না। দিনরাত ঐ লেকের পাড়েই থাকছে। ভীষণ চিন্তা হচ্ছে।

মাশা : মন ভালো নেই। [লজ্জা পেয়ে নীনাকে] কোস্টিয়ার নাটকটা থেকে একটু পড়ে শোনাও না নীনা।

নীনা : তুমি চাইলে পড়তে পারি। কিন্তু কেন যেন ছাড়া ছাড়া, ঠিক জমে না।

মাশা : [উৎসাহ দমে যায়] ও যখন পড়ে ওর চোখ দুটো কেমন জ্বলজ্বল করে আর চেহারাটা পাংশুটে হয়ে যায়। কোস্টিয়ার কণ্ঠে সুন্দর একটা দুঃখ দুঃখ ভাব আছে। দেখতেও কবি কবি লাগে। [সোরিন নাক ডাকে]

ডোরন : সবাইকে শুভরাত্রি।

আইরিনা : পেট্রুশা!

সোরিন : আরে, এটা কী হল?

আইরিনা : আর কী হবে, তুমি যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েছ।

সোরিন : ধেৎ, কী যে বল—ঘুমালাম কোথায়? [নীরবতা]

আইরিনা : তোমার তো এখন ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। খাচ্ছ না কেন?

সোরিন : ওষুধ হলে তো ভালোই হত কিন্তু ডাক্তার তো দেয় না।

ডোরন : ওষুধ? এই ষাট বছর বয়সে?

সোরিন : কেন? ষাট হলেই কি মানুষকে মরতে হবে নাকি?

ডোরন : ঠিক আছে, তাহলে কয়েক ড্রপ ভ্যালেরিয়ান নিয়ে নাও।

আইরিনা : এতে তুমি হয়তো বসন্তেও ফিরে যেতে পারবে।

ডোরন : হ্যাঁ, যেতে পারতেও পারে আবার না-ও পারতে পারে।

আইরিনা : তার মানে?

ডোরন : মানে কিছুই না [নীরবতা]

মেদভাদেনকো : পিওতর নিকোলাইভিচ, আপনার আসলে ধূমপান ছেড়ে দেয়া উচিত।

সোরিন : বাজে বকো না।

ডোরন : কথাটি কিন্তু খারাপ বলেনি। মদ এবং তামাক দুটোই মানুষের স্বাতন্ত্র্য বিনাশ করে। একটা চুরুট অথবা একটা গ্লাস ভোদকার পর তুমি আর আগের পিওতর থাকতে পার না। পিওতরের সাথে আরো কিছু যোগ হয়ে যাবে। মনে হবে অন্য কেউ অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তি।

সোরিন : [হেসে] এ ধরনের কথা তোমার ভালোই আসবে, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ তুমি সুন্দর গোছানো একটি জীবন যাপন করেছ। কিন্তু আমার কী? আমার কথা বলার কী আছে? সুদীর্ঘ আটাশ বছর বিচার বিভাগে কাজ করেছি, তোমাদের মতো বেঁচে থাকিনি কিংবা তেমন কোনো অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিনি—সময় চলে যাবার পর এখন বাঁচতে ইচ্ছে করছে। এখন সত্যি আমি বাঁচতে চাই। তুমি পরিপূর্ণ একটি জীবন দেখেছ আর হয়তো শখ নেই, সুতরাং দার্শনিকের মতো নির্বিকার কথা বলা তোমাকে মানায়—আমি বাঁচার স্বাদ কী তাই জানি না, সে জন্যেই বাঁচতে চাই। সে জন্যেই আমি ডিনারের সাথে সাথে শেরি পান করি এবং চুরুট টানি—এইসব, এই তো।

ডোরন : জীবনকে অবশ্যই গভীরভাবে উপভোগ উপলব্ধি করা উচিত। কিন্তু যৌবনে যা পাওনি যা করতে পারনি এখন এই ষাটের মাঝামাঝি যদি তাই পেতে চাও, তাহলে সেটা সময় অপচয় ছাড়া আর কিছুই হবে না।

মাশা : [উঠে দাঁড়ায়] খাবার সময় হয়ে গেছে। [ধীরে ধীরে ক্লান্ত গতিতে চলতে চলতে] আমার পা দুটো এর মাঝেই এলোপাতাড়ি পড়তে শুরু করেছে। [বেরিয়ে যায়]

ডোরন : মাশা ভিতরে গিয়ে খাবার আগেই বেশ খানিকটা গিলে নেবে।

সোরিন : আহা বেচারি! ওর বড় কষ্ট।

ডোরন : ও সব বাজে কথা।

সোরিন : হ্যাঁ এ কথা তোমার জন্যে বলা সহজ। জীবনে যা চেয়েছ তাই পেয়েছ।

আইরিনা : গ্রাম-গাঁয়ে থাকার চেয়ে আর বিরক্তিকর কিছু হয় না, বুঝলে? কেমন ভাপসা গরম। বসে বসে দর্শন আওড়ানো ছাড়া যেন

লোকগুলোরও কোনো কাজ নেই। তোমাদের সাথে গল্পগুজব করতে অথবা তোমাদের কথা শুনতে মন্দ লাগে না। তবে শহরের কোনো হোটেলের নির্জন কক্ষে বসে একা একা নাটকের লাইন মুখস্থ করার মতো সুখ আর কিছুতেই নেই। সে আনন্দই আলাদা।

নীনা : হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি আপনি কী বলছেন।

সোরিন : তুলনামূলকভাবে শহর ভালো, সেটা অবশ্য ঠিক। পড়ার ঘরে বসে থাক, দারোয়ান কাউকে ঢুকতে দেবে না, ব্যস। টেলিফোন করার সুবিধা, রাস্তায় নামলেই ভাড়া ট্যাক্সি—এ ধরনের আরো কত কী।—আসলে শহরের ব্যাপারই আলাদা।

ডোরন : [গুনগুন করে] 'বল তাকে সুন্দরী ফুল...' [প্রবেশ করে সামারায়েভ পেছনে পোলিনা আন্দ্রেইয়েভনা]

সামারায়েভ : সবাই এখানে? সুপ্রভাত। [প্রথমে আইরিনা পরে নীনার হাতে চুমু খায়] [নীনাকে] বাহ্ তোমাকে তো আজ দারুণ লাগছে! [আইরিনাকে] শুনলাম নীনাকে নাকি আপনি আজ শহরে নিয়ে যাবেন? তাই নাকি?

আইরিনা : হ্যাঁ তাই ভাবছি।

সামারায়েভ : খুব ভালো হবে। কিন্তু যাবেন কেমন করে। আজ তো রাই ওঠাচ্ছি, সকলেই ব্যস্ত। কোন ঘোড়া নেবেন? নিয়ে যাবার মতো ঘোড়াও তো নেই।

আইরিনা : কোন ঘোড়া মানে? আমি কী করে জানব কোন ঘোড়া?

সোরিন : কেন গাড়ির ঘোড়াই তো আছে।

সামারায়েভ : [উত্তেজিত] গাড়ির ঘোড়া? গাড়ি সাজানো এখন একদমই সম্ভব নয়। কোনো কিছুই যোগাড় নেই। আমার মাথায় ঢুকছে না এগুলো সব পাব কোথায়? মাদাম, আপনার প্রয়োজন বুঝি, আপনার তুলনাহীন প্রতিভার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে। আপনার জন্য আমার জীবনের দশটি বছর ব্যয় করেছি। কিন্তু ঘোড়া দেয়া সম্ভব নয়।

আইরিনা : শোন অতসব বোঝার দরকার নেই। আমার আজ যেতে হবে, ব্যস।

সামারায়েভ : হায়! কৃষিকাজের ঝামেলাটা যদি বুঝতেন!

আইরিনা : সেই একই পুরনো গপ্পো। ঠিক আছে, না থাকলে, গ্রাম থেকে ঘোড়া আনার ব্যবস্থা কর। না হয় তো স্টেশন পর্যন্ত হেঁটেই যাব। তবু আমার আজ মস্কো যেতেই হবে।

সামারায়েভ : তাহলে আমি এই কাজে ইস্তফা দিলাম। আপনি অন্য ম্যানেজার দেখুন।
[বেরিয়ে যায়]

আইরিনা : প্রতিবার গ্রীষ্মে এই একই ঘটনা ঘটবে। আমার নিজের বাড়িতে আমারই মুখের ওপর...না আর কখনো এ-মুখো হব না।
[Off Stage-এ গোসলখানার দিকে যায়। একটু পরে আবার ট্রিগোরিনকে নিয়ে প্রবেশ করে। ট্রিগোরিনের হাতে ছিপ ও মাছ ধরার সরঞ্জাম।]

সোরিন : নাহ—বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এ সব দেখতে দেখতে একদিন আমার মাথাই খারাপ হয়ে যাবে। শোন—যে কটা ঘোড়া আছে এই মুহূর্তে বেঁধে এখানে নিয়ে এস, যাও। একটুও যেন দেরি না হয়।

নীনা : [পোলিনাকে] আইরিনা নিকোলাইয়েভনা একজন অভিনেত্রী। ব্যস! তাঁর সামান্য খেয়ালখুশি এই জীর্ণজরা চাষবাসের চেয়ে অবশ্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। অথচ তাঁর নিজের কোনো দাম নেই। এটা কিন্তু দেখলেও বিশ্বাস হতে চায় না।

পোলিনা : [কিছুটা নিরাশ] আমার কী করার আছে বলুন। আমার জায়গায় আপনাকে ভেবে দেখুন। আমি কী করতে পারি?

সোরিন : [নীনাকে] চল দেখি আমার বোনের যাওয়া থামান যায় কিনা। [যে পথে সামারায়েভ গেছে সেদিকে তাকিয়ে] একটা জঘন্য একগুঁয়ে লোক।

নীনা : [সোরিনকে বসিয়ে দেয়] আপনি চেয়ারে বসুন আমি টেনে নিয়ে যাই। বসুন। [নীনা ও মেদভাদেনকো চেয়ার ঠেলতে থাকে] সাংঘাতিক কাণ্ড!

সোরিন : ঠিকই বলেছ। সাংঘাতিক! অথচ সে চাকরি ছেড়েও যাবে না। আজ সোজাসুজি বলব। [ডোরন ও পোলিনা ছাড়া সবাই বেরিয়ে যায়]

ডোরন : তোমার স্বামীটি একেবারেই বিরক্তিকর। ওকে এ বাড়ি থেকে বের করে দেয়াই উচিত। অবশ্য বের করেই-বা লাভ কী? ওরা নিজেরাই তো আবার অনুনয়-বিনয় করে ফিরিয়ে আনবে।

পোলিনা : ভেবে দেখ, গাড়ির ঘোড়াগুলোকে পর্যন্ত সে মাঠে ছেড়ে দিয়েছে। এ-রকমই করে, প্রতিদিন আমাকে বিপদে ফেলে। আমার অস্থির লাগে, নিজেকে অসুস্থ মনে হয়। ছুঁয়ে দেখ, আমার শরীর কাঁপছে। ওর এই বদরাগী স্বভাবটাই আমার সহ্য হয় না। [অনুরোধ করে] ইয়েভজিনি, কী হয়—রাখ-না আমাকে তোমার

সাথে। আমাদের সময় তো বয়ে যাচ্ছে—সে তারুণ্য আর নেই—যদি পারতাম জীবনের বাকি দিনগুলো সব ভণিতা ছেড়ে সব লোকচক্ষুকে উপেক্ষা করে যে ভাবে চলতে চাই—সেভাবে যদি...কী হয়—মানুষের কী ক্ষতি!

ডোরন : লক্ষ্মীটি, আমার বয়স কত জানো? পঞ্চান্ন। এখন কি আর ঘাট বদলাবার সময় আছে?

পোলিনা : জানি, আমি একা নই, তোমার আরো আছে, সে জানি। একটি মানুষ তো আর সবার জন্য হতে পারে না। ক্ষমা কোরো, আমি হয়তো তোমাকে মাঝে মাঝেই বিরক্ত করি। তুমি যে বিরক্ত হও সেটাও ভালোভাবেই বুঝি। [নীনাকে ঘরের কাছে ফুল তুলতে দেখা যায়]

ডোরন : না না, তা নয়। সে কথা নয়।

পোলিনা : আমার দারুণ হিংসে হয়। যতই বলি, তুমি তো ডাক্তার। মেয়ে তুমি এড়াবে কেমন করে।

ডোরন : [নীনাকে এদিকে আসতে দেখে] কী, ভিতরের উত্তেজনা কি কমেছে?

নীনা : আইরিনা কাঁদছেন আর পিওতরের হাঁপানি শুরু হয়েছে।

ডোরন : তাই নাকি? তাহলে তো আমার ভিতরে যেতে হয়—দুজনকেই ভ্যালেরিয়ানের ড্রপ দিতে হবে বোধ হয়।

নীনা : [ডোরনকে হাতের ফুলগুলো দিয়ে] আপনার জন্যে।

ডোরন : ধন্যবাদ। [বাড়ির ভিতরে চলে যেতে থাকে]

পোলিনা : [ডোরনের সাথে যেতে যেতে] কী সুন্দর ফুল! [ঘরের কাছে এসে] ওগুলো আমাকে দাও। [ডোরন ফুলগুলো পোলিনার হাতে দেয়—সে ফুলগুলো ছিঁড়ে-খুড়ে একপাশে ফেলে দেয়। দুজনেই বাড়ির ভিতরে যায়।]

নীনা : [স্বগত] এমন নামকরা একজন অভিনেত্রীকে কাঁদতে দেখলে কেমন যেন লাগে। তা-ও আবার অতি তুচ্ছ কারণে। ওদিকে একজন নামকরা বিখ্যাত লেখক সারাদিন মাছ ধরে কাটাচ্ছে, অদ্ভুত সব ব্যাপার। এরকম একজন খ্যাতনামা লেখক যাঁর বইয়ের দেদার কাটতি, যাঁকে নিয়ে কাগজপত্রে প্রায় প্রতিদিন প্রচুর লেখালেখি, কাগজে কাগজে যাঁর ছবি—যাঁর একটার পর একটা বই বিদেশি ভাষায় অনূদিত হচ্ছে সে লোক সারাদিন দুটো মাছ ধরতে পারলেই আনন্দিত হয়—আশ্চর্য কাণ্ড! আমার সব সময় মনে হত খ্যাতিমান লোকেরা ভিড়ভাট্টা তেমন পছন্দ করেন না। নিজেদের অহঙ্কার নিয়ে মানুষের থেকে দূরে থাকেন।

ভেবেছিলাম যাঁরা শুধু ধনসম্পদ অর্থকেই ভালোবাসে তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই খ্যাতিমান লোকেরা তাদের মান-মর্যাদা-খ্যাতি দিয়ে ওদের ওপর টেক্কা দেন। কিন্তু এখন দেখছি তেমন কিছুই না। এঁরা তো দেখছি দিব্যি সব সাধারণ মানুষের মতোই হাসছেন, কাঁদছেন, হতাশ হচ্ছেন। কেউ সামান্য দুটো মাছ ধরে আনন্দ পাচ্ছেন কেউ আবার তাসপাশা খেলে সময় কাটাচ্ছেন। আশ্চর্য!

ত্রেপলেভ : [একটি নিহত গাঙচিল ও বন্দুক নিয়ে প্রবেশ করে] তুমি কি একা?

নীনা : হ্যাঁ, [ত্রেপলেভ নীনার পায়ের কাছে গাঙচিলটা রাখে] আরে, আরে কী করছ?

ত্রেপলেভ : আজ এই পাখিটা মারতে আমার প্রাণপাখিটাই প্রায় যাচ্ছিল, সেটাই তোমার চরণ-প্রদীপে রাখলাম।

নীনা : কী হয়েছে তোমার? [গাঙচিলটা তুলে ভালো করে দেখে]

ত্রেপলেভ : এভাবেই একদিন আমি আমাকে মারব।

নীনা : তোমার হয়েছে কী? কোস্টিয়া, বল-না কী হয়েছে? তুমি তো এমন কখনো কর না। কী হয়েছে? এসব কিন্তু তোমাকে মানায় না।

ত্রেপলেভ : ঠিক বলেছ। তুমি বদলে গেছ; আমিও তাই বদলাতে শুরু করেছি। আমার থেকে তুমি মুখ ফিরিয়েছ, সেটা তুমিও জানো...আমার প্রতি তুমি উদাসীন, এমনকি আমাকে তোমার আর সহ্যও হয় না।

নীনা : ইদানীং তুমি দারুণ খিটখিটে হয়ে উঠেছ। কথায়-বার্তায় কেবলই হেঁয়ালি। তুমি যা বল তার এক অক্ষরও আমি বুঝি না। মনে হচ্ছে আমার পায়ের কাছে তোমার মৃত গাঙচিল। এ-ও যেন অন্য কিছু, যেন অন্য কোনো কথা। আমাকে ক্ষমা কর; এর আমি কিছুই বুঝি না। [গাঙচিলটাকে রেখে] কোস্টিয়া, আমি একেবারেই সাধারণ একটি মেয়ে, তোমার এ হেঁয়ালি বোঝার ক্ষমতা আমার নেই।

ত্রেপলেভ : সে রাতে আমার নাটকের ব্যর্থতা থেকেই এসবের শুরু। মেয়েরা কোনো ব্যর্থতাই মেনে নিতে পারে না। পরাজিতকে ঘৃণা করে। নীনা, সে নাটক আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। প্রতিটি পাতা প্রতিটি অক্ষর। ব্যর্থতাকে আমি বিনাশ করেছি, নীনা। আমার দুঃখের সীমা তোমার বোধের বাইরে সে আমি জানি। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছ বুঝতে পারি। কিন্তু কেন, কী জন্যে করলে তা বুঝি না। এ যেন কূল ছাপানো দিঘির পলকে

শুকিয়ে চৌচির হয়ে যাওয়া। তুমি এখনই বললে তুমি এত সরল যে আমাকে বুঝতে পার না। এতে বোঝাবুঝির কী আছে? আমার নাটক কেউ পছন্দ করেনি সুতরাং তুমি ধরেই নিয়েছ আমার কোনো প্রতিভা নেই—অন্য যে কোনো মানুষের মতো সাধারণভাবেই বুঝেছ। [সজোরে মাটিতে পদাঘাত] ওহ্—কত সহজে বুঝলাম—কত সহজে! ওহ্—আমার মাথার মধ্যে বুঝি কেউ পেরেক ঠুকছে—যাক গোল্লায় যাক—আমার অহমিকা— আমার জীবনীশক্তি যেন চুষে খাচ্ছে। আহ যেন বিষধর সাপ! [ট্রিগোরিন পড়তে পড়তে প্রবেশ করে] ওই যে আসছে প্রতিভাবান সেই ব্যক্তি, চালচলনে মনে হয় সে নিজেই হ্যামলেট, সাথে একটি বইও আছে। [ব্যঙ্গ করে] শব্দ শব্দ শুধু শব্দ।—নীনা, এখনো সূর্য তোমাকে তেমন করে ছোঁয়নি অথচ তাতেই তুমি ঝলসে উঠছে—ঝিকিমিকি হাসি—যেন সূর্যরাগে গলে গলে যাচ্ছে তোমার চোখ। ভালোই হল, আমি আর কোনো দিন তোমাকে বিরক্ত করব না। [দ্রুত বেরিয়ে যায়]

ট্রিগোরিন : [নোটবইতে কী সব টুকতে টুকতে] নস্যি নেয়, পান করে ভোদকা। এবং সব সময় কালো কাপড় পরে থাকে। একজন সাধারণ স্কুলমাস্টার তাকে ভালোবাসে।

নীনা : কেমন আছেন বরিস আলেকসেইভিচ।

ট্রিগোরিন : ভালো। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবেই বোধহয় আজ আমরা চলে যাচ্ছি। মনে হয় না আর কোনোদিন দেখা হবে। তোমার মতো তন্বী তরুণীদের সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ খুব বেশি আসে না। আসলে কী জানো আঠার-উনিশ বছরের অনুভূতিটাই ভুলে গেছি। কী আশ্চর্য! সে বয়সটা এখন কল্পনায়ও আনতে পারি না। হয়তো এ কারণেই আমার গল্প-উপন্যাসে তরুণ-তরুণীরা তেমন জীবন্ত হয়ে ওঠে না। কোথায় যেন ফাঁক থাকে। যদি এমন হত—যদি তোমার এই বয়সটাতে আমি মাত্র এক ঘণ্টার জন্যেও ফিরে যেতে পারতাম তাহলে বুঝে নেয়া সহজ হত তোমার মন কী বলে, কী অনুভূতি কী চিন্তা। সব।

নীনা : আহা! আমিও যদি পারতাম ক্ষণিকের জন্য ট্রিগোরিন হয়ে যেতে।

ট্রিগোরিন : কেন?

নীনা : বাহ্—তাহলে জানা যেত মস্তবড় বিখ্যাত সাহিত্যিক হলে কেমন লাগে। আচ্ছা, বলুন-না বিখ্যাত হলে কেমন লাগে।

ট্রিগোরিন : কেমন লাগে? জানি না। কোনোদিন ভেবেও দেখিনি। [একটু সময় ভাবে] হবে দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা, হয় তুমি আমার খ্যাতিটাকে বাড়িয়ে দেখছ নয়ত খ্যাতি-ট্যাতি কিছুই না।

নীনা : কিন্তু কাগজপত্রে তো আপনার সম্পর্কে লেখা আপনি নিশ্চয়ই পড়েন।

ট্রিগোরিন : হ্যাঁ, প্রশংসা করলে ভালোই লাগে। নিন্দা করলে বেশ কয়েকদিন মেজাজ খিঁচড়ে থাকে।

নীনা : কী অদ্ভুত জগতের মানুষ আপনি। আপনাকে আমার কী যে হিংসে হয় জানেন না। মানুষের ভাগ্য কত ভিন্ন, তাই না? অবশ্য বেশির ভাগ লোকই অসুখী। পরিচয়হীন ক্লান্তিকর অস্তিত্বকে টেনে নেয়া। শুধু টেনে নেয়া। অন্যদিকে, আপনার কথাই ধরুন, সহস্রজনে একজন। কী দারুণ উজ্জ্বল আর আকর্ষণীয় জীবন। এই জীবনের পরিচয় আছে, অস্তিত্ব আছে। ভাগ্য আপনারই।

ট্রিগোরিন : আমার। [কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে] দেখ তুমি আমার সুখ্যাতি, সুখ-উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয় জীবনের কথা বলছ। আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি। তোমার কথাগুলো এত চমৎকার, কিছু মনে কোরো না, যেন সুস্বাদু খাদ্য যা আমি কোনোদিনই খাইনি। তুমি সবে যৌবনে পা দিয়েছ; মনটাও নরম।

নীনা : কী চমৎকার জীবন আপনার!

ট্রিগোরিন : এর মাঝে চমৎকারের কী দেখলে? [ঘড়ির দিকে তাকিয়ে] যাই, আমাকে লিখতে হবে। কিছু মনে কোরো না, আমি এখন দাঁড়াতে পারছি না। [হাসি] তবে তুমি আমার একটা দুর্বল জায়গাতেই খোঁচাটা দিলে। বেশ মজা লাগছে, আবার রাগও হচ্ছে। ঠিক আছে, চল না-হয় কথাই বলি। আমার উজ্জ্বল আর আকর্ষণীয় জীবন সম্পর্কেই বলি। কোত্থেকে শুরু করা যায়। [একটু ভেবে] বাধ্যবাধকতা কী জিনিস জান? একটা লোক রাতদিন একই জিনিস নিয়ে কখন ধ্যান করে তুমি জান? মনে কর, চাঁদ। এই চাঁদকে কেন্দ্র করেই আমি দিবানিশি আবর্তিত। আমার একটাই ধ্যান—আমাকে লিখতে হবে। শুধুই লিখতে হবে। লিখতে আমাকে হবেই। এর মাঝে এমন একটা কিছু আছে যার কারণে একটা উপন্যাস শেষ হতে না হতেই আর একটা ধরি। তারপর আর একটা। আবার। এই তো। অবিরাম লিখছি। এর মাঝে আর সুন্দরের, চমৎকারের কী আছে? এ এক উদ্ভট ব্যাপার। এই যে এখন আমি তোমার সাথে আছি, ভালো লাগছে, কিছুটা চঞ্চলতাও আছে, তথাপি একটি মুহূর্তের জন্যেও কিন্তু ভুলতে

পারছি না যে টেবিলে একটি অসমাপ্ত উপন্যাস পড়ে আছে এবং আমাকে সেটা শেষ করতে হবে। আকাশের দিকে তাকিয়ে যদি কোনো পিয়ানো আকৃতির মেঘ দেখি সাথে সাথেই মনে হয় এটা কোনো গল্পে লাগাতে হবে। মনে কর বাতাসে সূর্যমুখী ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে অমনি মগজে নোট হয়ে যায় 'পাণ্ডুর সুবাস অথবা বৈধব্যের ফুল' গ্রীষ্মের রাত বর্ণনায় লাগবে। কুড়িয়ে পাওয়া প্রতিটি শব্দ তুলে রাখি। এই মুহূর্তে তুমি যা বলছ বা আমি নিজেই যা বলছি এর মাঝেও যদি জুতসই কোনো শব্দ এসে পড়ে তো তাকে সাথে সাথে আমার সাহিত্যের ভাঁড়ারঘরে তুলে রাখব কারণ পরবর্তী কোনো এক সময় শব্দটি আমি ব্যবহার করব। কাজ শেষে একটু বিশ্রাম বা নিজেকে কিছু সময় ভুলে থাকার জন্যেই থিয়েটারে যাই বা কোথাও মাছ ধরতে বসি—সেখানেও মুক্তি নেই। কোনো নতুন বিষয় লোহার বলের মতো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। অগত্যা ফিরতে হয়। আপনা আপনিই চলে আসি টেবিলে। শুরু হয় আবার সেই লেখা—অবিরাম। এ যেন এক বন্দিদশা। এই হয়, সব সময়ই এই হয়। নিজের কাছে আমার নিজের কোনো ছুটি নেই। কখনো কখনো মনে হয় আমি যেন আমার গোটা জীবনকেই গিলে খাচ্ছি। মানুষকে নির্যাসটুকু দেবার জন্যে জীবনের সবগুলো সুন্দর ফুল বৃন্ত থেকে তুলে আনছি, ছিঁড়ে ফেলছি, যেন মূল পর্যন্ত দলে বিনাশ করছি। তবু পরিত্রাণ নেই। কী ভাবছ? আমার মাথায় ছিট আছে, এই তো? তোমার কি মনে হয় আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আমাকে স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে করে? তারা সময় পেলেই ব্যঙ্গ করে জিজ্ঞেস করে—কী লিখছ এখন? কী হবে ওসব লিখেটিখে। এভাবেই বলতে থাকে বার বার। তারপর এক সময় আমি ভাবতে শুরু করি যে, বন্ধুবান্ধবদের মনোযোগ আমার দরকার নেই, তাদের প্রশংসা-প্রশস্তি সবই ভণ্ডামি। তারা আমাকে বোকা বানাতে চায়, যেন আমি একটি আস্ত পাগল। কখনো মনে হয় তারা যেন জোর করে ধরে পাগলাগারদে ঢুকিয়ে দেবে। যখন তরুণ ছিলাম, সবে লেখা শুরু করেছি সে সময় তো লেখালেখির ব্যাপারটা দস্তুরমতো পীড়াদায়ক ছিল। ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে প্রায় সব ছোটখাটো লেখকই নিজেদের নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় মনে করে। সব সময়ই কেমন যেন একটা ঘাবড়ানো ভাব। এইসব কারণেই ছোটখাটোরা প্রতিষ্ঠিত লেখকদের কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করে কিন্তু প্রতিষ্ঠিতরা কোনোদিন গ্রাহ্যও করে না। সুতরাং

নবাগতরা পকেটখালি নেশাগ্রস্ত জুয়াড়ির মতো উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়ায়, কারো চোখের দিকে তাকাতেও পারে না। যদিও আমি কোনোদিন আমার পাঠকদের দেখিনি তবু কিছু কিছু কারণে তাদেরকে আমার নির্দয় আর সন্দেহপ্রবণ মনে হত। লোকালয়ে তেমন যেতাম না। ভয় হত। আমার লেখা নতুন কোনো নাটক মঞ্চায়ন হলেই মনে হত তরুণেরা এর বিরোধিতা করবে আর বয়স্করা হয়তো গ্রাহ্যই করবে না। ওহ্ সে সব দিনের কথা মনে করা যায় না, নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় কাটত!

নীনা : তবু আপনার কিছু আনন্দ আর সুখের মুহূর্ত তো আছে নিঃসন্দেহে। বিশেষ করে যখন উৎসাহিত বোধ করেন। ভাবেন কাজটা ভালোই এগোচ্ছে।

ট্রিগোরিন : হ্যাঁ, তা ঠিক। লেখাটা আমি উপভোগ করি। এমনকি প্রুফ দেখেও ভালো লাগে, কিন্তু লেখা প্রকাশিত হয়ে যাবার পর আর ভালো লাগে না। সত্যি বলতে কি, একদম সহ্যই হয় না। হয়তো এখানে কিছুটা ফেলে গেছি নয়ত ওখানে কিছুটা কাটছাঁটের প্রয়োজন ছিল। মেজাজ একেবারে বিগড়ে যায়। [হাসি] তারপর সাধারণ পাঠক পড়ে বলে, হ্যাঁ ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর কাজ তবে টলস্টয়ের মতো নয় অথবা খুবই সুন্দর তবে তুর্গেনেভের 'পিতাপুত্র' এর চেয়ে অনেক ওপরের লেখা। এ ধরনের মন্তব্য আমার মরণ পর্যন্তই চলবে—ভালো, সুন্দর, চমৎকার কিন্তু তার বেশি নয়। তারপর এক সময় আমি মরে যাব। বন্ধুরা কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলবে ট্রিগোরিন ভালোই লিখত তবে তুর্গেনেভ সে ছিল না।

নীনা : কিছু মনে করবেন না, আমি অতশত বুঝতে চাই না। আসলে আপনার সাফল্যই কিন্তু আপনার মাথাটা খেয়েছে।

ট্রিগোরিন : সাফল্য! কিসের সাফল্য! আমি আমার নিজেকে কোনোদিন ভালোবাসতে পারিনি। আমি যা লিখি তা-ও আমার ভালো লাগে না। সবচেয়ে খারাপ কী জান? আমি একটা স্থবিরের মতো বেঁচে আছি। এমনকি অনেক সময় যা লিখি তা আমি নিজেই বুঝতে পারি না। আমি ভালোবাসি এই নির্জন দিঘি, গাছপালা, নির্মল আকাশ। প্রকৃতির কাছেই আমার যত ঋণ। এরা আমার মাঝে এক ধরনের আবেগ জাগায়, আমাকে লিখতে বাধ্য করে। কিন্তু কী জান? আমি তো শুধু একজন লেখকই নই যার কাজ শুধু কথা সাজিয়ে দৃশ্য আঁকা, আমি একজন নাগরিকও। আমি আমার দেশ ও মানুষকে ভালোবাসি। দেশের মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, ভবিষ্যৎ—আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিজ্ঞান, মানুষের অধিকার এসব নিয়ে

আমার লেখা উচিত। লেখক হিসেবে এ আমার কর্তব্য। আমি লিখিও। সবকিছু নিয়েই লিখি। ফরমায়েশি লেখা নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে গিয়ে অনেক সময় তাড়াহুড়ো করে ফেলি। মানুষ পড়ে গালাগাল করে। শিকারি কুকুর তাড়া করলে শিয়াল যেমন কোণঠাসা হয়ে যায়, আমিও তেমনি কোণঠাসা হয়ে ছটফট করি। দেখছি বিজ্ঞান এবং সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে আর আমি গাড়ি ফেল করা চাষির মতো সমানে পিছিয়ে যাচ্ছি। এক সময় মনে হয় আমি আসলে দৃশ্য আঁকা ছাড়া কিছুই করিনি—পারিও না। এ ছাড়া যা কিছু সবই মিথ্যা। নির্জলা মিথ্যা। অন্তস্তল পর্যন্ত মিথ্যা।

নীনা : জীবনে আপনি এত কাজ করেছেন যে নিজের গুরুত্বের বিচার করার সময় পাননি, হয়তো-বা সে বিচার করতেও আপনি চাননি। হতে পারে আপনি আজো অতৃপ্ত কিন্তু আমাদের কাছে আপনি এক বিরল প্রতিভা, বিরল ব্যক্তিত্ব। আপনার মতো লেখক হতে পারলে এটুকু জেনেই সুখী হতাম যে মানুষ একদিন আমার এই রথের চাকার সাথে নিজেদের বাঁধবে আর আমার খ্যাতির কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টাই হবে তাদের সবটুকু সুখ।

ট্রিগোরিন : রথ! তাই না? আমি কি আগামেমনন, নাকি অন্য কিছু। [উভয়ে হাসছে]

নীনা : লেখিকা বা অভিনেত্রী হবার আনন্দই আলাদা। সে আনন্দ যদি সত্যি পেতে চাই তো আমার বাবা-মা আমাকে ত্যাগ করবে, তা করুক আমার কিছু যায়-আসে না। রাইয়ের রুটি খেয়ে কোনো অবাঞ্ছিত চিলেকোঠায় বাস করতে আমার কিছু অসুবিধে নেই। কোনো মানবেতর জীবন যাপনে কুণ্ঠিত হব না। দুঃখ-কষ্টও হাসিমুখে নিতে পারব যদি তার পরিবর্তে খ্যাতি জোটে। খ্যাতি, সত্যি আলোড়িত হবার মতো খ্যাতি। [দু হাত দিয়ে মুখ ঢাকে] আহ্ এসব ভাবতেও আমার কেমন লাগছে।

আইরিনা : বরিস আলেক্সেইভিচ।

ট্রিগোরিন : [নীনাকে] আমাকে ডাকছে। আজই মনে হয় যেতে হবে। কিন্তু বিশ্বাস কর আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। [দিঘির দিকে ঘুরে তাকায়] কী চমৎকার! কী লোভনীয়, মনোরম!

নীনা : ঐ যে বাগান-ঘেরা বাড়িটা দেখছেন—

ট্রিগোরিন : হ্যাঁ।

নীনা : ওটা আমার মায়ের। ওখানেই আমার জন্ম। জীবনের সবটুকু সময় আমি এই লেকের পাড়ে কাটিয়েছি। এই লেকের মাঝে কোথায় কোন ঢিবি আছে সবই আমার জানা।

ট্রিগোরিন : জায়গাটা দারুণ সুন্দর। [মৃত গাঙচিলটা দেখে]

নীনা : গাঙচিল। কোস্টিয়া মেরেছে।

ট্রিগোরিন : আহ্ কী সুন্দর পাখি! সত্যিই আমি যেতে চাই না। নীনা, আইরিনাকে থেকে যেতে বল না। [নোটবইতে লিখছে]

নীনা : কী লিখছেন?

ট্রিগোরিন : টুকে রাখলাম। হঠাৎ করেই একটি গল্প মাথায় এল। তোমার মতো একটি তরুণী এই লেকের পাড়ে বাস করত। গাঙচিলের মতো সে এই লেককে ভালোবাসে। গাঙচিলের মতোই সুখী, মুক্ত। এখানেই একদিন কেউ একজন এল। দেখল মেয়েটিকে। লোকটি করার মতো কিছু পেল না। সে শুধু এক মৃত গাঙচিলের মতো মেয়েটিকে ধ্বংস করল। [জানালার কাছে আইরিনাকে দেখা যায়]

আইরিনা : বরিস আলেক্সেইভিচ। কোথায় তুমি?

ট্রিগোরিন : আসছি। [যেতে যেতে ফিরে ফিরে নীনাকে দেখে। জানালার কাছে গিয়ে।] কী হল?

আইরিনা : আমরা আজ যাচ্ছি না। [ট্রিগোরিন বাড়ির ভিতর চলে যায়]

নীনা : [চিন্তিত মুখে তাকায়] শুধুই স্বপ্ন!

তৃতীয় অঙ্ক

[সোরিনের খাবারঘর। ডানে-বামে দরজা। একটি সাইডবোর্ড ও ওষুধের কাবার্ড। ঘরের মাঝখানে একটি টেবিল। একটা তোরঙ্গ ও কতকগুলো কার্ডবোর্ডের বাক্স ইতস্তত ছড়ানো, মনে হচ্ছে এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার তোড়জোড়, বাঁধাছাঁদা চলছে। নাশতার টেবিলে ট্রিগোরিন একা খাচ্ছে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মাশা।]

মাশা : আপনি লেখক বলেই কথা কটা বলছি। চাইলে আপনার লেখাতেও কোনো সময় লাগিয়ে দিতে পারেন। সত্যি বলছি, কোস্টিয়ার যদি কিছু একটা হয়ে যেত তাহলে আমি বোধ হয় আর এক মুহূর্তও বাঁচতাম না। এখন যা হোক একটু সাহস হচ্ছে। আমি ঠিক করেছি আর না, আমার হৃদয় থেকে এ ভালোবাসা পুরোটাই উপড়ে ফেলব।

ট্রিগোরিন : কেমন করে?

মাশা : মেদভাদেনকোকে বিয়ে করব।

ট্রিগোরিন : সেই স্কুলমাস্টারকে?

মাশা : হ্যাঁ।

ট্রিগোরিন : কেন?

মাশা : কেন আবার? যে ভালোবাসার কোনো ঠিকানা নেই, গন্তব্য নেই, মরীচিকার মতো শুধু দূরে সরে সরে যায়, বছরের পর বছর তার পিছু ঘুরে কী হবে। যেখানে আপনি নিজেই জানেন না কার জন্য বসে আছেন সেখানে কিসের অপেক্ষা? বিয়ে করে ফেললে আর ভালোবাসার অবসর হবে না। নতুন দায়িত্ব এলে সব ভুলে যাব, আর কিছু না হোক এক ধরনের পরিবর্তন তো হবে। আর একটু চলুক—

ট্রিগোরিন : আর নেয়া কি ঠিক হবে?

মাশা : ধেত্তেরি! রাখুন তো। [দুটো গ্লাস ভরে দেয়] ওভাবে তাকাবেন না। মেয়েরা কত মদ খেতে পারে আপনি ভাবতেও পারবেন না। কেউ কেউ খোলাখুলি কেউ কেউ রেখেঢেকে এই যা। হ্যাঁ, আর সে-ও ভোদকা কনিয়াক। নিন [দুজনে গ্লাস দুটো ছোঁয়ায়] আপনি বড়

ভালো লোক, চলে যাচ্ছেন, খুব খারাপ লাগছে। [মদে চুমুক দেয়]

ট্রিগোরিন : আমারও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

মাশা : তাহলে বলুন ওকে থেকে যেতে।

ট্রিগোরিন : না, এখন আর ওকে থামানো যাবে না। ছেলেটা বড় নির্বোধের মতো কাজ করেছে। নিজেকে গুলি করে আহত করেছে, এখন আবার শুনছি আমাকেও নাকি মল্লযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ করছে। কিন্তু কেন? কী হয়েছে ওর? কেমন থমথমে ভাব। নিজে নিজেই যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। সে চায় শিল্পের একটা নতুন চেহারা দিতে। এ নিয়ে কাজও করছে, ভালোই তো। যেখানে নতুন আসে পুরাতন কি সেখানে থাকতে পারে না? এ নিয়ে এত গোল বাঁধাবার কী আছে?

মাশা : ও একটু ঈর্ষাপরায়ণ। অবশ্য তা দিয়ে আমার কোনো কাজ নেই। [নীরবতা। ইয়াকোভ একটা সুইকেস নিয়ে প্রবেশ করে। নীনা ঢুকে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।] আমার স্কুলমাস্টার হয়তো কিছুই না এমন। নিরীহ, গরিব। কিন্তু তার হৃদয় আছে। কোনো খাদ নেই ভালোবাসায়। তাঁর আর তাঁর বুড়ো মায়ের জন্য আমার কষ্ট হয়। যাক আপনার ভালো হোক এই কামনাই করি। ভুলবেন না যেন। [হাতে হাত মিলায়] আপনার বন্ধুতা আর এই সম্পর্কটুকুই আমার কাছে অনেক। এই জন্য কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। বই পাঠাবেন। 'শ্রদ্ধেয়া' বা ঐ জাতীয় কিছু লিখবেন না যেন—লিখবেন—'সেই ম্যারিয়াকে জীবনে যার কোনো স্থান নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই'। আসি। [বেরিয়ে যায়]

নীনা : [মুষ্টিবদ্ধ হাত ট্রিগোরিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে] জোড় বা ভীন?

ট্রিগোরিন : জোড়।

নীনা : [দীর্ঘশ্বাস] ঠিক হয়নি। একটা ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। নাটকে নামা ঠিক হবে কি হবে না, দেখলাম। ভালো হত যদি এ ব্যাপারে কেউ আমাকে উপদেশ দিতে পারত।

ট্রিগোরিন : এ ব্যাপারে কি কেউ কাউকে কিছু বলতে পারে? [নীরবতা]

নীনা : আপনি চলে যাচ্ছেন। হয়তো আর কোনোদিনও দেখা হবে না। এইটুকু রাখুন। [একটা মেডেল দেয়] হয়তো এই ক্ষুদ্র উপহারের কারণেই মাঝেমধ্যে মনে পড়বে। নিন, একদিকে আপনার সই খোদাই করা অন্যদিকে আপনার "দিবারাত্রি" বইয়ের নামটি আছে।

ট্রিগোরিন : চমৎকার! দারুণ সুন্দর উপহার তো। [মেডেলে চুমু]

নীনা : হয়তো কখনো মনে পড়বে।

ট্রিগোরিন : অবশ্যই। সেই সূর্যদীপ্ত উজ্জ্বল দিনে তোমাকে যেমন দেখেছিলাম মনে পড়লেই সেই দিনটির কথা মনে পড়বে। মনে আছে? এই হপ্তাখানেক আগে, তুমি সাদা ধপধপে কাপড় পরে দাঁড়িয়েছিলে। সিটের ওপর পড়ে ছিল ছোপ ছোপ রক্ত মাখা নিহত একটা সাদা গাঙচিল। আমরা কথা বলছিলাম।

নীনা : হ্যাঁ, গাঙচিল। [থেমে] নাহ্ কথা আর বলা হল না। কেউ একজন আসছে। আপনি যাবার আগে মিনিট দু-এক সময় দেবেন, আমার দুটো কথা আছে। [বেরিয়ে যায়। প্রবেশ করে আইরিনা ও সোরিন। তাদের পেছনে বাক্স-পেঁটরা নিয়ে ইয়াকোভ।]

আইরিনা : [সোরিনকে] তুমি বরং থেকেই যাও। বাতের ব্যথাটা তো এখনো কমেনি। কী যেতে পারবে? [ট্রিগোরিনকে] কে গেল? নীনা?

ট্রিগোরিন : হ্যাঁ।

আইরিনা : আমি বোধ হয় ব্যাঘাত সৃষ্টি করলাম। [বসে] যা হোক, গোছগাছ শেষ। বাব্বা হয়রান হয়ে গেছি।

ট্রিগোরিন : [মেডেলের ওপরের লেখা পড়ে] 'দিবারাত্রি' পাতা ১২১, লাইন ১১/১২।

ইয়াকোভ : [টেবিল মুছতে মুছতে] ছিপগুলো কি বেঁধে দেব?

ট্রিগোরিন : দাও। আবার তো লাগবে। বড়শিগুলো কাউকে দিয়ে দিও।

ইয়াকোভ : ঠিক আছে।

ট্রিগোরিন : [স্বগত] পাতা ১২১ লাইন ১১/১২। কী আছে সেখানে? [আইরিনাকে] তোমার এখানে কি আমার কোনো বই আছে?

আইরিনা : হ্যাঁ, পিওতরের পড়ার ঘরে আছে। একেবারে ঐ কোণার শেলফটিতে।

ট্রিগোরিন : পাতা ১২১...[বেরিয়ে যায়]

আইরিনা : পেট্রুশা, তুমি বরং থেকেই যাও।

সোরিন : তুমি চলে যাচ্ছ। আমার একা মন টিকতে চায় না।

আইরিনা : কিন্তু শহরে কী করবে?

সোরিন : তেমন বিশেষ কিছুই না। আমার জন্য দুই-ই সমান। কী আর করব, জেমসভো সিটি হলের ভিত্তিপ্রস্তর বসানো হবে, তাই না হয় দেখব। কিছু একটা করতে চাই। পরিবর্তনের জন্যই বেঁচে থাকা, তা দু'এক ঘণ্টার জন্যে হলেই-বা ক্ষতি কী? এক জায়গায় তো বহুদিন হয়ে গেল। শো-কেসে পুরনো সিগারেটদানির মতো বহুদিন পড়ে আছি। একটার দিকে ঘোড়া পাওয়া যাবে। তারপরই রওয়ানা হব।

আইরিনা : [কিছুক্ষণ নীরব] পেট্রুশা, তুমি বরং যেও না। এখানেই থাক। শুধু মন খারাপ করবে না আর ঠাণ্ডা লাগাবে না। ছেলেটাকে একটু দেখেশুনে রেখো। একটু আদরযত্ন কর, ভালো করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বোলো। [থামে] আমি তো দূরে চলে যাচ্ছি, আত্মহত্যার চেষ্টা কেন করল কিছু বুঝতে পারলাম না। হয়তো কোনো দিনই কিছু বুঝতে পারব না। তবে যতটুকু মনে হয়, ঈর্ষা। ট্রিগোরিনকে ও সহ্য করতে পারছে না। সুতরাং ট্রিগোরিনকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারি ততই মঙ্গল।

সোরিন : এটা তো অনেকগুলো কারণের একটা মাত্র। কারণ আরো আছে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সে বয়সে তরুণ, বুদ্ধিদীপ্ত, অথচ কপর্দকহীন, সামাজিক মর্যাদাহীন এমনকি ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনা ছাড়াই এই গাঁও-গ্রামে পড়ে আছে। করারও কিছু নেই। আলস্যে মরচে ধরছে শুধু। এটাই তার ভয় আর লজ্জার কারণ। ছোঁড়াটা আমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। আমারও ওর জন্যে খুব টান। কিন্তু তাতে কী হবে? তাতে তো আর আসল সমস্যার সমাধান নেই। ও মনে করে এখানে ওর কোনো অধিকারই নেই, তোমার করুণায় বেঁচে আছে। যাই যা বলি ছেলে বড় হয়েছে সাথে সাথে আত্মমর্যাদাও তো হয়েছে। এটাও তো একটু ভাবতে হয়।

আইরিনা : আমার ছেলেটাই আমার সব উদ্বেগের কারণ। [ভেবে] আসলেই ওর একটা কিছু করা দরকার।

সোরিন : [শিস দেয়। আমতা আমতা করতে থাকে।] আমার মনে হয় ওকে তোমার কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে যাওয়া উচিত। ভালো কাপড়চোপড় নেই, দেখছ না, গত তিন বছর ধরে সেই একই পুরনো জ্যাকেট পরছে, এমনকি একটা টপকোটও নেই। এভাবেই সে ঘুরে বেড়ায়। একটু বিদেশ-টিদেশ গেলেও হয়। আনন্দ-ফুর্তি করতে পারত। ওতে মন ভালো হত কিন্তু খুব বেশি খরচও হত না।

আইরিনা : ধর, কাপড়চোপড় না হয় দিলাম। একটা স্যুট বানিয়ে নিক, কিন্তু বিদেশ পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না। সত্যি বলতে কি এ মুহূর্তে ওর স্যুট বানানোর পয়সাই আমার কাছে নেই। [দৃঢ়ভাবে] আমার কাছে কোনো পয়সাই নেই। [সোরিন হাসে] সত্যিই নেই।

সোরিন : [শিস দিতে দিতে] ক্ষমা করে দিও, আসলে আমি তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। তুমি উদার দয়ালু, সে আমি জানি।

আইরিনা : [ছলছল চোখে] সত্যি বলছি, আসলেই আমার কাছে কোনো পয়সাকড়ি নেই।

সোরিন : আমার থাকলে দিতাম। কিন্তু আমি তো একেবারেই কপর্দকহীন। [হেসে] আমার পেনশনে যা আসে সেটা ম্যানেজার খামারের গরু-বাছুর আর মৌমাছি কিনেই শেষ করে। গরু, মৌমাছি কিছুই বাঁচে না, শুধু কিছু পয়সার অপচয়। আর ঘোড়া তো আমি কোনো দিনই ব্যবহার করতে পারি না।

আইরিনা : কিছু টাকা আমার কাছে আছে, সেটা সত্য। কিন্তু বুঝতেই তো পারছ আমি একজন অভিনেত্রী। পোশাক-আশাকের যে বিল আসে আমাকে ফতুর করতে সেটাই যথেষ্ট।

সোরিন : তুমি খুব ভালো। সে জন্য তোমাকে আমি শ্রদ্ধাও করি—হ্যাঁ... কিন্তু এ কী এমন লাগছে কেন—আমার বোধ হয় আবার কিছু একটা হচ্ছে, মাথাটা ঘুরছে [টেবিলের এককোণা ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে] আমি বোধ হয় জ্ঞান হারাচ্ছি...।

আইরিনা : [আতঙ্কিত] পেট্রুশা, [টাল সামলাতে সাহায্য করে] পেট্রুশা আমার লক্ষ্মী ভাই, কী হয়েছে? [ডেকে] এই কে আছ—একটু ধর, ধর। [মাথাভর্তি ব্যান্ডেজ নিয়ে ত্রেপলেভ ঢোকে, সাথে মেদভাদেনকো।] দেখ, কেমন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।

সোরিন : না-না তেমন কিছু হয়নি। ঠিক আছে। [একটু পানি খায়] ঠিক হয়ে গেছে।

ত্রেপলেভ : [মাকে] ভয় পেও না মা। তেমন মারাত্মক কিছু না। ইদানীং মামার মাঝে মাঝেই এরকম হচ্ছে। [মামাকে] চল মামা, ভেতরে গিয়ে একটু শুয়ে থাকলে ভালো লাগবে।

সোরিন : হ্যাঁ, তাই। একটু শুতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে শহরে কিন্তু আমি যাবই। [লাঠি ভর দিয়ে বেরিয়ে যায়]

মেদভাদেনকো : [হাত ধরে। সোরিনকে সাহায্য করে।] আপনাকে একটা ধাঁধা দিই, বলুন তো কী এমন জিনিস যা সকালে চার পায়ে হাঁটে, দুপুরে দুই পায়ে আবার সন্ধ্যায় তিন পায়ে হাঁটে?

সোরিন : ঠিকই বলেছ—এবং রাতে চিত হয়ে। হয়েছে ছাড়, ছেড়ে দাও, আমি একাই পারব।

মেদভাদেনকো : না বাবা, অত ভদ্রতায় কাজ নেই, শেষটায় আবার আর এক বিপদ ঘটাবেন। [সোরিনের সাথে বেরিয়ে যায়]

আইরিনা : বাব্বাহ! একেবারে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

ত্রেপলেভ : মা, তুমি মামাকে হাজার দুই রুব্‌ল দিলেই তো পার, তাহলে তো সে সারা বছর শহরে থাকতে পারে। গ্রামে তার পোষায় না—সব সময়ই কেমন মনমরা হয়ে থাকে।

আইরিনা : আমার কোনো টাকা-পয়সা নেই। আমি কোনো ব্যাংকার নই, সামান্য একজন অভিনেত্রী মাত্র। [নীরবতা]

ত্রেপলেভ : এই ব্যান্ডেজটা একটু পাল্টে দাও না মা। তুমি তো ভালো পার।

আইরিনা : [ওষুধের তাক থেকে একটা আয়োডিনের শিশি ও ব্যান্ডেজ বের করে] ডাক্তার আসতে বুঝি দেরি করে ফেলল।

ত্রেপলেভ : দশটার মধ্যে আসবে বলেছিল, দুপুর গড়িয়ে গেল।

আইরিনা : বস। [মাথা থেকে ব্যান্ডেজ ধীরে ধীরে খোলে] এটাকে তো একটা পাগড়ির মতো মনে হয়। গতকাল এক লোক জিজ্ঞেস করেছিল তুমি কোন দেশি লোক। [ভালো করে ক্ষত দেখে] বাহ্‌বা সেরেই তো গেছে প্রায়। এখানটায় একটু কাঁচা আছে এখনো। [ছেলের মাথায় চুমু খায়] আমি তো কিছুদিন থাকছি না, তুমি বন্দুক নিয়ে আর খেলতে যেও না, কেমন?

ত্রেপলেভ : এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি; আর না। তখন সে অবস্থায় আমার হিতাহিত জ্ঞানই ছিল না। আর এমন হবে না। [মায়ের হাতে চুমু খায়] কী সুন্দর তোমার হাত দুটো, মা। বহুদিন আগে, আমি তখন ছোট, আমাদের বাড়ির আঙিনায় বেদম মারামারি হয়েছিল। এক ধোপানিকে কারা যেন ধুম মেরেছিল। মনে আছে তোমার? বেচারি অচেতন হয়ে পড়েছিল! তুমি বার বার ওষুধ নিয়ে তাকে দেখতে গেলে। তার বাচ্চাদের নিজের হাতে গোসল করালে। মনে নেই তোমার?

আইরিনা : না। [একটা নতুন ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়]

ত্রেপলেভ : দুজন ব্যালে নর্তকী তখন আমাদের বাড়িতে থাকত। তারা এসে প্রায়ই তোমার সাথে কফি খেত।

আইরিনা : হ্যাঁ, তা মনে আছে।

ত্রেপলেভ : ওরা ধর্মভীরু ছিল তাই না? [নীরবতা] মাত্র ঐ কটা দিন আমি তোমাকে সেই ছোট্টবেলার মতো কাছে পেয়েছিলাম—আদর করেছিলাম, ভালোবেসেছিলাম। এখন তো তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তাহলে কেন তুমি ঐ লোকটার কথামতো চলবে?

আইরিনা : ওকে তুমি বুঝতে পার না। আমি যাদের দেখেছি তাদের মধ্যে এই লোকটি একটি ব্যতিক্রম। কোস্টিয়া, তুমি বোঝ না এ লোকটি একজন বিশেষভাবে সম্মানিত ব্যক্তি।

ত্রেপলেভ : সম্মানিত! কিসের সম্মান? ও তো কাপুরুষ। ওকে আমি মল্লযুদ্ধে ডেকেছি। কিন্তু সে কাপুরুষের মতো ভাগছে। কী লজ্জা!

আইরিনা : কী যা-তা বলছ! আমি নিজে তাকে যেতে বলেছি।

ত্রেপলেভ : তোমার জানা বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি! এখানে তুমি আর আমি তাকে নিয়ে কথা কাটাকাটি করছি আর দেখ গিয়ে ওখানে তিনি

হয়তো আমাদের বাগানে অথবা ড্রইংরুমে আমাদের নিয়ে কৌতুক করছেন। নীনার সুপ্ত প্রতিভা আবিষ্কার করছেন নয়ত তিনি যে একজন বিরল প্রতিভা এ কথা নীনাকে চূড়ান্তভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

আইরিনা : তার সম্পর্কে এ ধরনের অশোভন উক্তি করে তুমি আনন্দ পাচ্ছ, কিন্তু আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। সুতরাং আমার সামনে ওভাবে বলবে না।

ত্রেপলেভ : ঠিক আছে, বলব না। আমি জানি তুমি চাও তোমার মতো আমিও ওকে প্রতিভাবান মনে করে শ্রদ্ধাভক্তি করি। দুঃখিত। ওটা কোনোদিনই সম্ভব নয়, মা। তুমি জানো মিথ্যে আমি বলি না—ওর কোনো বই-ই পড়ার মতো নয়। একদম অসহ্য।

আইরিনা : তুমি একটা আস্ত হিংসুটে। সাধারণ মানুষেরা যখন নিজেদের অসাধারণ মনে করতে শুরু করে তখন তারা সত্যিকার প্রতিভাবানদের অযথাই হেয় করে—নিন্দা করে। তুমিও তাই করছ। আর এটা করে তুমি নিজে আনন্দ পাচ্ছ।

ত্রেপলেভ : [বিদ্রূপ] সত্যি প্রতিভা! [রেগে] প্রতিভার কথাই যদি বল তাহলে তোমাদের যে কারোর চেয়েই সেটা আমার বেশি আছে। [মাথার ব্যান্ডেজ ছিঁড়ে ফেলে] তোমার মতো কতকগুলো প্রথাবিশ্বাসী একগুঁয়ে লোক আজ শিল্প-সাহিত্যের উঁচু জায়গা জবরদখল করে রেখেছে। তোমরা নিজেরা যেটা কর তাকেই আসল এবং বৈধ বলে মনে কর। অন্য সবকিছুকে শ্বাসরুদ্ধ করে বন্ধ করার ফন্দি আঁটো। তোমাদের ফুটো কর্তৃত্ব আমি মানি না। তোমাকে অথবা তোমার ঐ সম্মানিত ব্যক্তি কাউকেই আমি গুণি না।

আইরিনা : তুমি একটা অপদার্থ। ভুঁইফোঁড়।

ত্রেপলেভ : যাও তোমার সেই অমূল্য নাট্যমঞ্চেই ফিরে যাও। তৃতীয় শ্রেণীর নোংরা আজেবাজে নাটকেই অভিনয় করগে, যাও।

আইরিনা : কোনোদিনও আমি তৃতীয় শ্রেণীর নোংরা নাটকে অভিনয় করিনি। যাও, আমাকে একা থাকতে দাও। তুমি কী পার? কী যোগ্যতা আছে তোমার? একটি দৃশ্যও তো সুন্দর করে লিখতে পার না। তুমি কেভের একটি ভাড়াটে লেখক ছাড়া কিছু নও। পরগাছা!

ত্রেপলেভ : তুমি অর্থলোভী, হাড়কিপটে।

আইরিনা : ভবঘুরে। [ত্রেপলেভ বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে] পরিচয়হীন। [উত্তেজিত হয়ে পায়চারি শুরু করে] [থামে] কেঁদো না একটুও কেঁদো না। [ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে] খবরদার, একটুও না। [ত্রেপলেভের কপালে, গালে ও মাথায় চুমু খায়] চুপ কর, লক্ষ্মী

আমার। চুপ কর। তোর মা একটা ডাইনী, অসুখী মহিলা। আমি একটি মুহূর্তের জন্যও সুখ পাই না বাবা, আমাকে ক্ষমা কর কোস্টিয়া।

ত্রেপলেভ : [মাকে জড়িয়ে ধরে] মা, তুমি একটু যদি জানতে, একটু যদি বুঝতে পারতে। আমার কী আছে? তুমি নেই। নীনাও আর আমাকে ভালোবাসে না। আমার লেখা ফুরিয়ে গেছে, আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ হয়ে গেছে।

আইরিনা : না—হতাশ হবার কিছু নেই। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ট্রিগোরিন তো আজই চলে যাবে। ব্যস। তারপর তোমার নীনা তোমারই। সে তোমাকে ভালোবাসবে। [ত্রেপলেভের চোখ মুছে দেয়] চল, অনেক হয়েছে, আর না বাবা, চল। কী, সব ঠিক হয়ে গেল তো?

ত্রেপলেভ : [মায়ের হাতে চুমু খেয়ে] হ্যাঁ, হয়েছে। হয়েছে।

আইরিনা : [আদর করে] ট্রিগোরিনের সাথে বিবাদটা মিটিয়ে ফেল। মল্লযুদ্ধে আর দরকার নেই।

ত্রেপলেভ : ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ তাই হবে। তবে ওর সাথে আমি দেখা করব না। ওকে আমার সহ্য হয় না। [ট্রিগোরিন প্রবেশ করে] ঐ যে এসে গেছে—আমি যাই। [ড্রেসিঙের জিনিস উঠিয়ে কাবার্ডে রাখে] ঠিক আছে, ডাক্তারই আমার ড্রেসিং করে দেবে।

ট্রিগোরিন : [বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে] ১২১ পাতা, লাইন ১১/১২—এই যে—এখানেই তো আছে [পড়ে] 'যদি কখনো কোনোদিন আমার জীবন প্রয়োজন মনে কর তো নিয়ে যেও।' [ত্রেপলেভ মেঝে থেকে ব্যান্ডেজ উঠিয়ে নিয়ে বাইরে চলে যায়]

আইরিনা : এখনই গাড়ি এসে যাবে।

ট্রিগোরিন : [স্বগত] 'যদি কখনো কোনোদিন আমার জীবন প্রয়োজন মনে কর তো নিয়ে যেও।'

আইরিন : [ট্রিগোরিনকে] তোমার জিনিসপত্র সব তৈরি?

ট্রিগোরিন : [অস্থিরভাবে] হ্যাঁ—হ্যাঁ—[চিন্তিত] বুঝি না, ঐ শুদ্ধাত্মার অনুনয় কেন আমাকে এমন বিষণ্ন করে তুলছে। কেন আমার হৃদয়ে এমন করুণার দহন। 'যদি কখনো কোনোদিন আমার জীবন প্রয়োজন মনে কর তো নিয়ে যেও।' [আইরিনাকে] আচ্ছা, আর মাত্র একটি দিন কি আমরা থেকে যেতে পারি না? [আইরিনা না-সূচক মাথা নাড়ে] লক্ষ্মীটি, আর একটি দিন।

আইরিনা : আমি জানি কে তোমাকে এখানে টানছে। একটু সংযত হবার চেষ্টা কর না। সে তোমাকে নেশাগ্রস্ত করেছে, কিন্তু এখন তোমার নেশা কেটে যাওয়া উচিত।

ট্রিগোরিন : তোমারও একটু নমনীয় হওয়া উচিত। একটু বুদ্ধি খাটাও, যুক্তিতে এস। প্রকৃত বন্ধুর মতো ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা কর। [আইরিনার হাত ধরে] তুমি তো ত্যাগ করতে পার। তুমি তো আমার বন্ধু, খুলে দাও না শিকল, ছেড়ে দাও না আমাকে।

আইরিনা : সে কি এতই মোহময়ী?

ট্রিগোরিন : এ এক সাংঘাতিক আকর্ষণ। মনে হচ্ছে এতকাল আমি যা চেয়েছি ঠিক যেন তাই।

আইরিনা : গ্রাম্য বালিকার সরল ভালোবাসা! হায় ট্রিগোরিন, কত সামান্যই-না তুমি তোমাকে জানো।

ট্রিগোরিন : মানুষ কোনো কোনো সময় শুদ্ধাশুদ্ধ বোঝে না। এখন আমার সেই সময়। এই যে এখন আমি এখানে, তোমার কাছে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তই আমি তার স্বপ্নে বিভোর। মৃদু মিষ্টি একটা স্বপ্ন সারাক্ষণ আমাকে ঘিরে আছে। আইরিনা, তোমাকে মিনতি করি, আমাকে যেতে দাও।

আইরিনা : না না বরিস—তুমি অমন করে বোলো না। আমি বাস্তবিক সাধারণ নারী, ওভাবে বোলো না। আমাকে অসহ্য যন্ত্রণার মাঝে ছুড়ে ফেলে দিও না, বরিস, আমি যে ভয় পাই।

ট্রিগোরিন : তুমি চাইলে তুমি যা তার চেয়েও বেশি হতে পার। মানুষের জীবনে একমাত্র পাওয়া, যা সত্যি পাওয়া বলে মনে হয়, একমাত্র, যা সত্যি সুখ দিতে পারে সে হল প্রেম। চিরতরুণ উথালপাথাল প্রেম। কাব্যিক ভালোবাসা। সে ভালোবাসা মানুষকে স্বপ্নের ঝলমলে প্রাসাদে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আইরিনা, আমি জীবনে কখনো সে ভালোবাসা পাইনি। কোনোদিন অনুভব করিনি। যৌবনে ভালোবাসার সময় হয়নি। দুবেলা খেয়ে বেঁচে থাকার যুদ্ধ করেছি; কোনো না কোনো সম্পাদকের দোরগোড়ার ধরনা দিতেই সবগুলো সময় ফুরিয়ে গেছে। আজ হঠাৎ করেই যেন সব কেমন হয়ে গেল। সেই না-পাওয়া ভালোবাসা এখন আমার কাছে এসেছে। ইশারায় ডাকছে, তাকে অনুসরণ করতে বলছে। বল, কেমন করে তাকে ফেলে যাই?—আর পালাবই-বা কেন?

আইরিনা : আহ্—নিজেকে এভাবে পুরোপুরি হারিয়ে ফেল না!

ট্রিগোরিন : কেন নয়?

আইরিনা : আহ—চারদিক থেকে ষড়যন্ত্রের তীর আমাকে বিদ্ধ করছে কেন। [ফুঁপিয়ে ওঠে]

ট্রিগোরিন : [দুই হাতের মধ্যে মুখ রেখে] তুমি বুঝতে পারছ না। তুমি বুঝতে চাচ্ছ না।

আইরিনা : আমি কি সত্যি বুড়ো কুৎসিত যে তুমি আমাকে অন্য মেয়ের কথা শোনাচ্ছ? [ট্রিগোরিনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়] তুমি আর তোমার মধ্যে নেই। তবু জানি তুমি আমার অপূর্ব সুন্দর। আমার জীবনের শেষ পাতা। [হাঁটু গেড়ে বসে] আমার আনন্দ, আমার গর্ব, আমার সুখ। [হাঁটু জড়িয়ে ধরে] মাত্র একদণ্ডের জন্যেও যদি তুমি আমাকে ছেড়ে যাও আমি বাঁচব না। আমি পাগল হয়ে যাব ট্রিগোরিন, তুমি আমার বিস্ময়, আমার চমক, হৃদয়বান তুমি, তুমিই আমার বিধাতা।

ট্রিগোরিন : কেউ এসে পড়বে, ওঠ। [আইরিনাকে হাত ধরে ওঠায়]

আইরিনা : আসুক, আসতে দাও। তোমাকে ভালোবাসায় আমার লজ্জা নেই। [ট্রিগোরিনের হাতে চুমু খায়] লক্ষ্মী আমার, তুমি আত্মহারা হতে চাইলেও তোমাকে আমি হতে দেব না। না-না দেব না [হেসে] তুমি আমার, শুধু আমার। এই কপাল আমার, এই চোখ, এই সুন্দর রেশমি চুল সব, সব আমার। তুমি কেবলই আমার। ঈশ্বর তোমাকে অনেক কিছু দান করেছেন। তুমি প্রতিভাবান, তুমি আধুনিক লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রাশিয়ার একমাত্র আশা। তোমার লেখায় এমন সারল্য বিশুদ্ধতা মৌলিকত্ব আর সজীব করার ক্ষমতা আছে যে তোমার কলমের আলতো ছোঁয়ায় যে কোনো চরিত্র বা দৃশ্যের মূল শক্তি ফুটে ওঠে। তোমার বইয়ের সবগুলো মানুষই জীবন্ত। পড়ে কেউ বিমুগ্ধ না হয়ে পারে না। হায়! তুমি মনে করছ আমি বীরের বেদিমূলে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি, শুধু তোষামোদ করছি। তাকাও, দেখ, আমার চোখের মাঝে তাকিয়ে দেখ, আমি কি মিথ্যেবাদী, ছলনাময়ী? তুমি জান একমাত্র আমিই তোমাকে প্রকৃত অর্থে মূল্যায়ন করতে পারি। এই পৃথিবীতে একমাত্র আমিই তোমাকে সত্যি কথা বলি। প্রিয়তম আমার, এখনো কি বোঝ না? হ্যাঁ, বল, বল আমাকে ছেড়ে যাবে না।

ট্রিগোরিন : আমার নিজের কোনো ইচ্ছাশক্তি নেই। কখনো ছিল না। আমার মতো একজন দুর্বলচিত্ত একান্ত বাধ্যগতকে মেয়েরা কেন যে চায় বুঝি না।

ঠিক আছে তুমিই আমাকে নাও। উড়িয়ে নিয়ে যাও যতদূর তুমি চাও। শুধু তোমার থেকে কোনোদিন দূরে যেতে দিও না।

আইরিনা : [স্বগত] আমার, শুধু আমার। [স্বাভাবিকভাবে, যেন কিছুই হয়নি।] তুমি যদি চাও আরো কিছু সময় থেকে যেতে পার। আমি একাই

চলে যাই। তোমার তো এমন কোনো তাড়াহুড়ো নেই, চাইলে আগামী সপ্তাহের শেষের দিকেও আসতে পারবে।

ট্রিগোরিন : না, একসঙ্গেই যাব চল।

আইরিনা : তোমার যেমন ইচ্ছে। তাহলে একসঙ্গেই। [নীরবতা। ট্রিগোরিন তার নোট লেখে।] কী লিখছ?

ট্রিগোরিন : আজ সকালে দুটো দারুণ সুন্দর শব্দ শুনেছি, 'কুমারীর গহীনারণ্য।' টুকে রাখলাম, হয়তো কখনো কোথাও লাগবে। [আলস্য ভাঙে] তাহলে আমরা যাচ্ছি। আবার ট্রেন, স্টেশন, রেস্তোরাঁ, চপ, কথাবার্তা।.....

সামারায়েভ : [প্রবেশ করে] দুঃখের সাথে জানাচ্ছি সবকিছু ঠিকঠাক, এখনি রওয়ানা হওয়া উচিত। দুটো পাঁচ মিনিটে গাড়ি স্টেশনে লাগবে। আইরিনা নিকোলাইয়েভনা, আপনি কি আমার একটু উপকার করবেন? সুজদালজেভ কোথায় আছে একটু খুঁজে বের করতে হবে। জানতে ইচ্ছে করছে সে কি বেঁচে আছে না মরে গেছে? বেঁচে থাকলে কেমন আছে। বহুদিন আগে আমরা দুজনে এক সঙ্গে বসে মদটদ খেতাম। 'দি মেইল রবারি'তে তার সে কী অভিনয়—ইজমাইলভ নামে আরো একজনার কথা মনে আছে। দুঃখের রোল করত। এলিজাবেথগ্রাদে ওরা দুজনই একত্রে অভিনয় করত। সে-ও দারুণ লোক ছিল। [আইরিনা বিরক্ত হয়ে অগ্রসর হতে যায়] না না এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই, আরো পাঁচ মিনিটের আগে আমরা রওয়ানা হচ্ছি না।—হ্যাঁ, একবার ওরা দুজনেই কী একটা জমজমাট নাটকে যেন ভিলেনের রোল করছিল—

একটা জায়গায় এসে ওদের সংলাপ ছিল 'উই আর কট ইন এ ট্র্যাপ।' কিন্তু ইজমাইলভ বলল, 'উই আর টট, ইন এ ক্যাপ' [উচ্চস্বরে হেসে] টট ইন এ ক্যাপ, [সামারায়েভ যখন কথা বলছে ইয়াকোভ তখন ব্যস্তভাবে সুটকেস গোছাচ্ছে। একটি কাজের মেয়ে আইরিনার হ্যাট কোট ছাতা ও দস্তানা নিয়ে প্রবেশ করে। অন্য সবাই মিলে সেগুলো আইরিনাকে পরিয়ে দেয়। বাঁ দিকের দরজা দিয়ে শেফ তাকিয়ে দেখে, কয়েক মুহূর্ত উসখুস করার পর প্রবেশ করে। এরপর একে একে পোলিনা, সোরিন ও সবশেষে প্রবেশ করে মেদভাদেনকো।]

পোলিনা : [হাতে ছোট একটা বাক্স] এর মাঝে কিছু পাকা ফল আছে। পথে লাগবে। পথে হয়তো তেমন কিছু পাওয়া যাবে না।

আইরিনা : সত্যি তোমার দয়ার মন পোলিনা আন্দ্রেইভনা।

পোলিনা : আমি যাই। আপনি যেমন চেয়েছেন তেমন হয়তো কিছুই করতে পারিনি। ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন, কিছু মনে নেবেন না। [ফুঁপিয়ে কাঁদে]

আইরিনা : [পোলিনাকে জড়িয়ে ধরে] না-না ঠিক ছিল, সবই ঠিক ছিল। কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। কাঁদে না পোলিনা। কাঁদতে নেই।

পোলিনা : সময় কত তাড়াতাড়ি চলে যায় তাই না?

আইরিনা : হ্যাঁ, আমাদের কিছুই করার নেই! কারো কিছু করার থাকেও না।

সোরিন : [ওভারকোট, হ্যাট চাপিয়ে হাতে একটা বেতের লাঠি নিয়ে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। কথা বলতে বলতে এক পাশ থেকে অন্য পাশে হেঁটে যায়।] একটু তাড়াতাড়ি কর। আর দেরি হলে ট্রেন ফেল করবে। আমি গাড়িতে গিয়ে বসলাম। [বেরিয়ে যায়]

মেদভাদেনকো : আমি স্টেশন পর্যন্ত হেঁটেই যাব। চলুন, আপনাদের উঠিয়ে দিয়ে আসি। আমার তেমন সময় লাগবে না।

আইরিনা : সবাইকে বিদায়। সবকিছু ঠিকঠাক চললে আবার আগামী গ্রীষ্মে দেখা হবে। [কাজের মেয়ে, ইয়াকোভ এবং শেফ হাতে চুমু খায়।] তোমরা আবার আমাকে ভুলে যেও না। [শেফকে একটা রুবল দেয়] এটা তোমরা তিনজনে ভাগ করে নিও।

শেফ : অনেক ধন্যবাদ মাদাম। যাত্রা শুভ হোক। আপনার দয়ার কথা আমাদের মনে থাকবে।

ইয়াকোভ : ঈশ্বর, পথে যেন কোনো বিপদ না হয়।

সামারায়েভ : সম্ভব হলে মাঝেমধ্যে দু-এক কলম আমাদের লিখবেন। খুব খুশি হব। যাত্রা শুভ হোক বরিস আলেক্সেইভিচ।

আইরিনা : কোস্টিয়া কোথায়? তাকে বল আমি যাচ্ছি। এখন তো আর দেরি করা যাচ্ছে না। [ইয়াকোভকে] শেফের হাতে একটা রুবল দিয়ে গেলাম, তোমরা তিনজনে ভাগ করে নিও।

[সবাই বেরিয়ে যায়। মঞ্চ খালি। নেপথ্যে বিদায় দেবার শোরগোল শোনা যাচ্ছে। কাজের মেয়েটা এসে টেবিল থেকে ফলের বাক্সটা নিয়ে আবার বেরিয়ে যায়।]

ট্রিগোরিন : [ফিরে আসে] আমার বেতের লাঠিটা ফেলে গেছি। এখানেই তো রেখেছিলাম। [বাঁ দিকের দরজার দিকে হেঁটে যায়। এবং দরজার মুখেই নীনার সাথে দেখা হয়ে যায়।] ওহ্ তুমি! আমরা তো চলে যাচ্ছি...

নীনা : জানতাম আবার আমাদের দেখা হবে। [উত্তেজিতভাবে] বরিস আলেক্সেইভিচ, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি থিয়েটারেই যোগ দেব।

আগামীকালই যাচ্ছি। আমি আমার বাবা ও অন্যান্য সবকিছু ত্যাগ করেই যাচ্ছি। শুরু করব নতুন জীবন। সিদ্ধান্ত নিয়েছি—মস্কো যাব। ওখানেই আপনার সাথে দেখা হবে।

ট্রিগোরিন : [অপরাধীর মতো পিছনের দিকে দেখে] স্লাভনস্কি বাজারের কাছটাতেই থেকো। পৌঁছেই আমাকে জানাবে। আমার ঠিকানা মোলসানোভকা—স্রোহোলস্কি হাউস—আর দাঁড়াতে পারছি না...

নীনা : একটু মাত্র, এক মিনিট...

ট্রিগোরিন : [চাপা স্বরে] তুমি সত্যি সুন্দরী। তোমার সাথে আবার দেখা হবে ভাবতেই মনটা ভরে যাচ্ছে। [নীনা ট্রিগোরিনের বুকের ওপর মাথা এলিয়ে দেয়।] ভাবতে ভালো লাগছে তোমার এ মোহিনী চোখ আবার দেখব, তোমার ঐ স্বর্গীয় সুন্দর মুচকি হাসি, এই কোমল শরীর, দেবীর মতো পবিত্র পূর্ণ প্রকাশ আবার দেখব। নীনা... [দীর্ঘ চুম্বন]

[তৃতীয় এবং চতুর্থ অঙ্কের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান দুই বছর।]

চতুর্থ অঙ্ক

[সোরিনের বসার ঘরটা এখন ত্রেপলেভের পড়ার ঘর। ডান ও বাঁ পাশের দরজা দিয়ে অন্য ঘরগুলোতে যাওয়া যায়। মাঝখানের ফ্রেঞ্চ দরজা বাইরের চত্বরের দিকে খোলা। ডানদিকের কোণায় একটা বেঞ্চ এবং বাঁ দিকের দরজার পাশে একটা সোফা। একটা বই-শেলফ ও ড্রইংরুমের অন্যান্য আসবাবপত্র। জানালার কানায় ও চেয়ারের উপর বইপত্র ছড়ানো। সময়টা সন্ধ্যা। ঘরময় মৃদু আলো ছড়ানো। টেবিলল্যাম্পে শেড দেয়া। গাছের পাতায় ও চিমনিতে বাতাসের শব্দ। টহলদারদের পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। প্রবেশ করে মাশা ও মেদভাদেনকো।]

মাশা : [ডাক দেয়] কনস্টানটিন গেভ্রিলোভিচ, কনস্টানটিন গেভ্রিলোভিচ, [চারদিক তাকিয়ে] না—এখানে তো কেউ নেই। বুড়োও পারে; সারাক্ষণ কোস্টিয়া কোথায় কোস্টিয়া কোথায়। ওকে ছাড়া একদমই চলতে পারে না।

মেদভাদেনকো : বুড়ো দারুণ একা। [কান পেতে শোনে] আকাশের অবস্থা কী বিচ্ছিরি দেখেছ? দুদিন ধরে এরকম থমথম করছে।

মাশা : [বাতিটা বাড়িয়ে] দেখেছ লেকের ঢেউগুলোও কেমন জোরালো হচ্ছে।

মেদভাদেনকো : বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আচ্ছা ভালো কথা, বাগানের পুরনো মঞ্চটাকে তো ভেঙে ফেলতে পারি। কেমন একটা উলঙ্গ বিদঘুটে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে থাকে আজকাল। বাতাসে জীর্ণ পর্দাগুলো মাঝে মাঝে শব্দ করে। কাল রাতে ওদিক দিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলাম কে যেন কাঁদছে।

মাশা : আর কিছু আছে?

[নীরবতা]

মেদভাদেনকো : মাশা, চল বাড়ি যাই।

মাশা : [মাথা নাড়িয়ে] না, আজ রাতে আমি এখানেই থাকছি।

মেদভাদেনকো : [অনুরোধ] চল লক্ষ্মীটি, বাচ্চাটা না-খেয়ে থাকবে।

মাশা : বাজে বকো না। খিদে পেলে ম্যাট্রিওনা খাওয়াবে।

মেদভাদেনকো : ওর জন্যে খুব খারাপ লাগছে, আজ নিয়ে তিন রাত্রি ও তোমাকে কাছে পায়নি।

মাশা : কী বিরক্তিকর হয়ে উঠছ তুমি আজকাল! আগে তো মাঝেমধ্যে দর্শন আওড়াতে। এখন দেখছি প্রতি মুহূর্তেই বাচ্চা আর বাড়ি—বাচ্চা আর বাড়ি। অন্য কোনো কথা নেই?

মেদভাদেনকো : চল না।

মাশা : তুমি যাও।

মেদভাদেনকো : তোমার বাবা তো আমাকে ঘোড়া দেবেন না।

মাশা : কেন দেবেন না? চাও।

মেদভাদেনকো : ঠিক আছে আমি যেতে পারব, কিন্তু কাল তুমি আসবে তো?

মাশা : [নস্যি নেয়] ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে—কাল আসব। এখন একটু ঘ্যানর ঘ্যানর বন্ধ কর তো। [পোলিনা ও ত্রেপলেভ প্রবেশ করে। ত্রেপলেভের হাতে বালিশ ও কম্বল, পোলিনার হাতে চাদর। তারা সবগুলো সোফার উপর রাখে। ত্রেপলেভ তার পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে পড়ে।] এসব কার জন্যে মা?

পোলিনা : পিওতর নিকোলাইভিচের জন্য। সে কোস্টিয়ার ঘরে শোবে।

মাশা : এখানে? আচ্ছা দাও আমি বিছানা ঠিক করে দিচ্ছি। [বিছানা পেতে দেয়]

পোলিনা : [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] শেষ বয়সে মানুষ শিশু হয়ে যায়।...[হেঁটে লেখার ডেস্কের কাছে যায়। কনুইয়ে ভর দিয়ে একটা পাণ্ডুলিপি দেখতে থাকে। নীরবতা।]

মেদভাদেনকো : আমি বরং যাই। আসি মাশা। [স্ত্রীর হাতে চুমু] আমি আসি মা। [শাশুড়ির হাতে চুমুর চেষ্টা করে]।

পোলিনা : [বিরক্তি] যেতে হলে যাও না।

মেদভাদেনকো : আসি কনস্টানটিন গেভ্রিলোভিচ। [কনস্টানটিন কোনো কথা না বলেই হাতটা বাড়িয়ে দেয়। বেরিয়ে যায় মেদভাদেনকো।]

পোলিনা : [পাণ্ডুলিপির দিকে তাকিয়ে] কোস্টিয়া, কে জানত তুমি একদিন সত্যি সত্যি লেখক হবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কাগজপত্রও এখন তোমার কাজের মূল্য দেয়।

[কোস্টিয়ার চুলে বিলি কাটে] তুমি দেখতে কত সুন্দর হয়েছ। কোস্টিয়া, তুমি কত ভালো ছেলে, মাশার প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হতে পার না?

মাশা : মা, ওকে একটু নিরিবিলি থাকতে দাও।

পোলিনা : [ত্রেপলেভকে] মাশা বড় ভালো মেয়ে। [নীরবতা] মেয়েরা কী চায় জানো? চায় কেউ তার প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হোক। বিশ্বাস কর, আমি জানি।

[ত্রেপলেভ কিছু না বলে উঠে বাইরে বেরিয়ে যায়]

মাশা : আহা মা, আবার ওকে রাগিয়ে দিলে। কেন যে ওর পিছনে পিছনে ঘ্যানর ঘ্যানর কর বুঝি না।

পোলিনা : তোমার কষ্ট যে আমি দেখতে পারি না।

মাশা : তাতে যেন আমার কত ভালো হচ্ছে?

পোলিনা : তোমার কষ্ট আমার বুকের মধ্যে বেঁধে। আমি সব দেখি, সব বুঝি।

মাশা : বাজে কথা। আশা ছাড়া ভালোবাসা? ওসব নাটক-নভেলেই সম্ভব। জীবন আলাদা। আসলে এটা তেমন কিছুই না। নিজের হাল ধরার ক্ষমতাটুকু শুধু থাকতে হয়। আশার লাগামটা টেনে দাও। কবে কোথায় কী পরিবর্তন হবে তার জন্য অপেক্ষা করে কী হবে? ওটাই আমাকে শেষ করছে। এবার থেকে আশাই ছেড়ে দেব। ভালোবাসা যদি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তো তাকে নিষ্ঠুর হাতে থামিয়ে দেব। ভুলে যাব। যা হোক, আমার স্বামীর বদলি হবার কথা চলছে। অন্য কোথাও গেলে আমি সবটুকু ভুলে যাব। আমার এ হৃদয় থেকে সব ভালোবাসা উপড়ে ফেলে দেব।

[দুইঘর ওপাশেই করুণ সুরের ওয়ালজ বাজে]

পোলিনা : আহা ছেলেটি আবার বাজাচ্ছে! কী এমন কষ্ট তার!

মাশা : [ওয়ালজ নৃত্যের দু-তিনটি স্টেপ দিয়ে] আসলে কি জানো মা, ওর সাথে আমার দেখা না-হওয়াটাই উচিত। সেমিওনের বদলিটা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, দেখবে মাসখানেকের মধ্যেই সব ভুলে যাব। ভেবে দেখলাম সম্পূর্ণটাই একটা অর্থহীন ব্যাপার।

[ডোরন এবং মেদভাদেনকো সোরিনের হুইল চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে প্রবেশ করে]

মেদভাদেনকো : আমার ওপর এখন ছয়জন লোকের ভার। তাদের আহার কাপড়চোপড়। এক পাউন্ড আটাই তো দুই কোপেক।

ডোরন : হ্যাঁ, সে জন্যেই তো। সংসার চালাবার জন্য তো তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে।

মেদভাদেনকো : এ কথা বলা আপনার জন্য সহজ। আপনার যা চাহিদা তার চেয়ে অর্থ বেশি যে।

ডোরন : অর্থ! ত্রিশ বছরের প্রাকটিস। এই ত্রিশটি বছর প্রতি মুহূর্তে কখন রোগীর বাড়ি থেকে ডাক আসবে সেই অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে। এতদিনে মাত্র দু হাজার রুবল বাঁচিয়েছি। তা-ও এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে উড়িয়েছি, এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

মাশা : [তার স্বামীকে] তুমি এখনো যাওনি?

মেদভাদেনকো : [ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে] কেমন করে যাই? একটা ঘোড়া চেয়েছিলাম তা-ও দিল না।

মাশা : [গলা নিচু করে তিক্তভাবে] তোমাকে আমার আর সহ্য হয় না। [সোরিনকে এক পাশে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হল। পোলিনা, মাশা, ডোরন তার পাশে বসে। মেদভাদেনকো বিমর্ষ, একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।]

ডোরন : ওমা! এ দেখি দারুণ পরিবর্তন! বসার ঘরটা পড়ার ঘর করে ফেলেছ?

মাশা : কনস্টানটিন গেভ্রিলোভিচের জন্য করা হয়েছে। এখন সে চাইলেই বাইরের বাগানে পায়চারি করতে পারে, ওখানে নিরিবিলি চিন্তা করতে পারে।
[টহলদারদের মাটিতে লাঠি ঠোকার শব্দ শোনা যায়]

সোরিন : আমার বোন কোথায় গেল?

ডোরন : ট্রিগোরিনকে আনার জন্য স্টেশনে গেছেন। একটু পরেই ফিরবেন।

সোরিন : অসুখটা মনে হয় বাড়ছে। তাকে আনতে কাউকে পাঠাও না। [থামে] কী মজার ব্যাপার দেখ, আমি অসুস্থ পড়ে আছি অথচ ওষুধ দেবার একটি লোকও নেই।

ডোরন : আমি তো আছি। বল কী ওষুধ দেব? ভ্যালেরিয়ান ড্রপস, সোডা না কুইনিন?

সোরিন : সেই একই প্যাঁচাল। মনে হচ্ছে এরপর তুমি দর্শন আওড়াতে শুরু করবে। না আর ভালো লাগছে না। [সোফার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে] আমার বিছানা ঠিক হয়েছে?

পোলিনা : পিওতর নিকোলাইভিচ, সে তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল।

সোরিন : ধন্যবাদ।

ডোরন : [গুনগুন করে] 'নিশীথের আকাশ পারে ভেসে বেড়ায় চাঁদ।'

সোরিন : আমি কোস্টিয়াকে একটা গল্প লেখার প্লট দেব ভাবছি। নাম হবে 'অনেক সাধ ছিল যার।' তরুণ বয়সে ভেবেছিলাম লেখক হব; হইনি। স্বনামধন্য বক্তা হবার সাধ জেগেছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত যা কিছু বলেছি সবই অশ্রাব্য অকথ্য। যেমন ধর "এন্ড অল দ্যাট সর্ট অব থিং এন্ড অল দ্য রেস্ট অব ইস্ট এন্ড সো অন এন্ড সো ফোর্থ" চাকরি অবস্থায় যখন কোনো মামলা প্রায় শেষ করে আনতাম তখন উঠে হাঁটতে শুরু করতাম। হাঁটতেই থাকতাম, ঘামে ভিজে গোসল না-করা পর্যন্ত হাঁটতে থাকতাম। বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, তা-ও হয়নি। জীবনের প্রতিটি দিন আমি শহরে কাটাতে চেয়েছিলাম কিন্তু, দেখ, এই গাঁয়ের মাটিতেই ইতি টানছি। এ ধরনের আরো অনেক অতৃপ্ত বাসনা...

ডোরন : কেন, রাষ্ট্রীয় এটর্নি হতে চেয়েছিলে তা তো হয়েছ।

সোরিন : [হাসি] আমি চাইনি। কীভাবে যেন হয়ে গেছে।

ডোরন : বাষট্টি বছর বয়সে জীবনের যাবতীয় না-পাওয়ার লিস্ট তৈরি করছ, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছ, এটা একটু কেমন লাগছে না?

সোরিন : ডাক্তার তুমি থাম। কেউ একজন বাঁচতে চায়, জীবিত থাকতে চায়, বুঝতে পারছ?

ডোরন : মূর্খের মতো কথা বোলো না। প্রতিটি জীবন শেষ হয়ে যাবে। পারবে তুমি এ নিয়ম ভাঙতে?

সোরিন : যে মানুষ জীবনে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে তার মুখে এ ধরনের কথাই মানায়। তুমি সব পরিপূর্ণভাবে পেয়েছ, আর কী চাই? ভয়ও মরে গেছে তোমার। কিন্তু মৃত্যু যখন সত্যি সত্যি আসবে তখন ঠিকই ভয় পাবে।

ডোরন : মৃত্যুর ভয় ব্যাপারটা পশুদের। ও নিয়ে কেন ভাবছ? যারা ধার্মিক, মরণকে ভয় করবে তারা, ধার্মিকরা মরণোত্তর জীবনে বিশ্বাস করে, কাজেই কৃতকর্মের জন্য ওপারে শাস্তি পাবার একটা ভয় তাদের আছে। কিন্তু তোমার ভয় কেন? প্রথমত তুমি ধার্মিক নও। দ্বিতীয়ত তুমি কী এমন পাপ করেছ? গত পঁচিশ বছর ধরে আদালতে বিচারকের কাজ করেছ—এই তো, আর কী?

সোরিন : [হেসে] পঁচিশ নয়, আটাশ বছর।

[ত্রেপলেভ প্রবেশ করে সোরিনের পায়ের কাছে একটি বেঞ্চিতে বসে। মাশা একটু পরপরই তার দিকে তাকায়।]

ডোরন : কনস্টানটিন গেভ্রিলোভিচের কাজে আমরা ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি।

ত্রেপলেভ : না-না, তেমন কোনো অসুবিধা নেই। [থামে]

মেদভাদেনকো : ডাক্তার, কিছু মনে করবেন না, মাঝে একটু কথা বলি। আচ্ছা কোন শহরটা আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে?

ডোরন : জেনেভা।

ত্রেপলেভ : কেন, জেনেভা কেন?

ডোরন : সেখানে সবকিছু জীবন্ত। তুমি যত রাত্রেই হোটেল থেকে বের হও-না কেন রাস্তায় মানুষ ভর্তি। তুমি যেখানে ইচ্ছে যেতে পার। সর্বত্র মানুষের ভিড়। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সেই ভিড়ের একজন বলে মনে হয়। মনে হয় এদের সবার সাথে এক সাথে বেঁচে উঠছি। দৃঢ় বিশ্বাস আসে বিশ্ব-আত্মার অস্তিত্বে। এটা তোমার নাটকের সেই বিশ্ব-আত্মার মতোই ব্যাপার কোস্টিয়া। তোমার মনে আছে? সেই যে বছর দুয়েক আগে তোমার লেখা

নাটকে যে চরিত্রটিতে নীনা অভিনয় করেছিল। ভালো কথা, নীনা এখন কোথায় আছে? সে ভালো আছে তো?

ত্রেপলেভ : হয়তো ভালোই আছে।

ডোরন : কে যেন বলল সে নাকি অদ্ভুত জীবন যাপন করছে। কী হয়েছে?

ত্রেপলেভ : সে অনেক বড় কাহিনী ডাক্তার মামা।

ডোরন : হোক না। সংক্ষেপ করে বল, শুনি। [নীরবতা]

ত্রেপলেভ : সে যে ঐ বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল, তারপর ট্রিগোরিনের প্রেমে পড়ল, সে সব তো আপনি জানতেন, তাই না?

ডোরন : হ্যাঁ, তা জানতাম।

ত্রেপলেভ : একটি বাচ্চা হয়েছিল, বাচ্চাটি মারা যায়। এক সময় ট্রিগোরিনের কাছেও নীনার আকর্ষণ আর তেমন থাকেনি। ট্রিগোরিন, যেমনটি হয়, তার পুরনো বলয়ে ফিরে যায়। তবে সে তার পুরনো যোগাযোগ কখনোই ছিন্ন করেনি। তার মতো মেরুদণ্ডহীন প্রাণী অবশ্য সেটা পারেও না। দুদিকের যোগাযোগই রক্ষা করে চলছিল সে। আমি যেটুকু জানি নীনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত।

ডোরন : থিয়েটার ক্যারিয়ারের কী হল?

ত্রেপলেভ : সেটা মনে হয় আরো খারাপ। প্রথম দিকে মস্কোর কাছে একটা ছোট্ট থিয়েটারে কাজ শুরু করেছিল। সেখান থেকে প্রাদেশিক থিয়েটারে যায়। ঐ পর্যন্ত তার খোঁজখবর আমি নিয়মিত রেখেছি। মাসের পর মাস আমি ছায়ার মতো তাকে এখানে ওখানে অনুসরণ করেছি। সব সময়ই বড় বড় রোলে অভিনয় করত কিন্তু অভিনয়ে কখনো ম্যাচুরিটি দেখাতে পারেনি। সব সময় থেকে গেছে কিছুটা কাঁচা আর গ্রাম্য। তারস্বরে চিৎকার, বেশি বেশি হাত-পা নাড়াচাড়া এই সব ছিল। অবশ্য দু-একটি জায়গাতে সে বরাবরই ভালো করত। কোনো কান্নার দৃশ্য অথবা মৃত্যু-দৃশ্য—এগুলোতে সত্যি সত্যি দারুণ! তখন মনে হত, না, আছে কিছুটা প্রতিভা, সত্যিই আছে। কিন্তু সে-ও ঐ মুহূর্তের জন্যেই।

ডোরন : তাহলে প্রতিভা কিছুটা ছিল, কী বল?

ত্রেপলেভ : সে কথা বলা শক্ত। ধরে নিই ছিল। আমি তাকে দেখতাম কিন্তু আমাকে সে কখনো দেখেনি। ইচ্ছে করেই হোটেলে কোনোদিন দেখা করিনি। জানতাম তার মনের অবস্থা ভালো না। তাই দেখা করার আগ্রহও প্রকাশ করিনি। [নীরবতা] এই তো, আর কী বলব? এরপর আমি যখন এখানে ফিরে এলাম তখন তার লেখা

কিছু চিঠি পেয়েছি। মায়া-জড়ানো ধারালো চিঠি। সে কখনোই কোনো অভিযোগ করেনি, কিন্তু আমি বুঝতাম তার কষ্ট হচ্ছে। চিঠির প্রতিটি লাইনে দুঃখ স্পষ্ট হয়ে উঠত, কিছুই লুকানো থাকেনি, কিন্তু অভিযোগ করেনি কখনো। কখনো মানসিক অবস্থার জন্যেই চিঠির ভাষা অসম্ভব অগোছালো মনে হত। চিঠি শেষে সব সময় লিখত 'গাঙচিল'। ঐ যেমন পুশকিনের 'The River Nymph'-এ মিলার নিজেকে দাঁড়কাক বলে উল্লেখ করত সেরকম। মজার ব্যাপার হল নীনা এখন এখানেই আছে।

ডোরন : এখানে মানে?

ত্রেপলেভ : এখানে মানে এই শহরেই একটা হোটেলে। গত পাঁচ দিন ধরে আছে। আমি আর মাশা দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখা করেনি। সেমিওন বলছে, ও নাকি গতকাল এখান থেকে মাইলখানেক দূরে নীনাকে কোন মাঠের মধ্যে হাঁটতে দেখেছে।

মেদভাদেনকো : হ্যাঁ দেখেছি। মনে হল শহরের দিকে যাচ্ছে। আমি দেখে মাথা নাড়ালাম। এখানে কেন এল না সে কথাও জিজ্ঞেস করলাম। বলল আসবে।

ত্রেপলেভ : সে আসবে না। [নীরবতা] ওর বাবা-মা ওর মুখই দেখতে চায় না। কোনোমতে যাতে বাড়ির কাছেও না যেতে পারে সে জন্য দারোয়ান রেখেছে। [ডাক্তারের সাথে লেখার টেবিলের দিকে যায়] ডাক্তার মামা, কাগজ-কলমে দার্শনিক হওয়া সহজ কিন্তু বাস্তবজীবনে বড় কঠিন।

সোরিন : বড় ভালো মেয়ে ছিল।

ডোরন : কী?

সোরিন : বললাম নীনা বড় ভালো মেয়ে ছিল। আমি নিজেও ক্ষণিকের জন্য ওর প্রেমে পড়েছিলাম, বুঝলে।

ডোরন : তাই নাকি বুড়ো প্রেমিক?

[নেপথ্যে সামারায়েভের হাসি শোনা যায়]

পোলিনা : মনে হয় ওরা স্টেশন থেকে ফিরল।

ত্রেপলেভ : হ্যাঁ মা'র শব্দ পাচ্ছি। [আইরিনা ও ট্রিগোরিন প্রবেশ করে। সামারায়েভ তাদের অনুসরণ করে।]

সামারায়েভ : [ভিতরে প্রবেশ করতে করতে] আমরা সবাই বুড়ো হয়ে শীতের পাণ্ডুর পাতার মতো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছি অথচ আপনি চিরদিন একই রকম, জীবন্ত, সৌম্য সুন্দর ধপধপে ফর্সা কাপড়ের মতো।

আইরিনা : এখনো কি তুমি আমার জন্য দুর্ভাগ্য কামনা কর? তুমি চিরদিনই তাই করলে।

ট্রিগোরিন : [সোরিনকে] পিওতর নিকোলায়েভিচ, কেমন আছেন? এতদিন পরেও যদি বলেন ভালো লাগছে না সেটা কিন্তু ভালো নয়। [মাশাকে দেখে খুশি হয়] এই যে ম্যারিয়া ইলিনিশনা।

মাশা : মনে আছে? [হাত মিলায়]

ট্রিগোরিন : থাকবে না? বিয়ে করেছ?

মাশা : সে তো অনেক আগে।

ট্রিগোরিন : সুখী তো? [ডোরন এবং মেদভাদেনকোর প্রতি মাথা নাড়ে, তারাও প্রতি-উত্তর দেয়। তারপর ত্রেপলেভের দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে।] আইরিনা নিকোলাইয়েভনা বলেছেন, তুমি পুরনো কথা নাকি সব ভুলে গেছ। এখন আর আমার ওপর তোমার কোনো রাগ নেই। [ত্রেপলেভ হাত বাড়িয়ে দেয়]

আইরিনা : [ছেলেকে] নাও, এই পত্রিকাটা বরিস তোমার জন্য এনেছেন। এর মধ্যে তোমার সবশেষ গল্প ছেপেছে।

ত্রেপলেভ : [পত্রিকাটা নিয়ে ট্রিগোরিনকে] অনেক ধন্যবাদ।

ট্রিগোরিন : তোমার ভক্তরা অনেক শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে—পিটার্সবুর্গ ও মস্কোর লোকজন তোমার কাজ সম্পর্কে দারুণ উৎসাহী—তারা মাঝে মাঝেই আমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি দেখতে কেমন, কত বয়স, লোক কেমন। কিন্তু মজার ব্যাপার কী জান, সবাই মনে করে তোমার অনেক বয়স, জীবনের অভিজ্ঞতা প্রচুর—গভীরতা আছে। তোমার আসল নাম কেউ জানে না। বেনামে লিখছ কেন? তুমি 'ম্যান ইন দি আয়রন মাস্ক'-এর লোকটির মতোই রহস্যজনক।

ত্রেপলেভ : এবার কিছুদিন থাকছেন তো?

ট্রিগোরিন : না থাকতে পারছি না। কালই মস্কো ফিরব। হাতে একটি উপন্যাস আছে, শেষ করতে হবে। তারপর একজনকে কথা দিয়েছি একটা সাহিত্য সংকলনের জন্য কিছু কাজ করব। সেই আগের মতোই। সময় পাই না। [তারা যখন কথা বলছে আইরিনা ও পোলিনা সেই অবকাশে একটা তাসের টেবিল সরিয়ে এনে ঘরের মাঝখানে রেখেছে এবং সেটা খুলে ফেলেছে। সামারায়েভ মোম জ্বালিয়ে চেয়ারগুলো ঠিক জায়গামতো বসিয়ে দিল। কাবার্ড থেকে একটা লোটো বোর্ড বের করে আনে] আবহাওয়া কী বিচ্ছিরি দেখেছ। কেমন ঝোড়ো বাতাস। সকালের দিকে যদি কিছু সময়ের জন্যে বাতাস কমে তাহলে একটু মাছ ধরতে যাব। আর বাগানের যেখানটায় তোমার নাটকটা করেছিলে ওখানে একটু ঘুরে বেড়াব। একটা গল্পের প্লট

পেয়েছি। পুরনো দৃশ্যগুলোতে সশরীরে গিয়ে স্মৃতিটাকে একটু ঝালাই করে নেব আর কী।

মাশা : [তার বাবাকে] বাবা, সেমিওনকে একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দাও না, ওর বাড়ি যাওয়া দরকার।

সামারায়েভ : [ব্যঙ্গ করে] ওর একটা ঘোড়া দরকার। বাড়ি যেতে হবে? [দৃঢ়ভাবে] তুমি তো নিজেই দেখলে ঘোড়া সবে স্টেশন থেকে ফিরল। এখন আর বাইরে দেয়া সম্ভব না।

মাশা : ওগুলো ছাড়াও তো আছে। [তার বাবা কিছু বলছে না দেখে অধৈর্য হয়ে এ পাশ-ওপাশ করে] ওহ্—বাবা।

মেদভাদেনকো : ঠিক আছে, মাশা, আমি হেঁটেই যেতে পারব।

পোলিনা : এই দুর্যোগের মধ্যে হেঁটে যাবে? [দীর্ঘশ্বাস] এস সবাই। [তাসের টেবিলে বসে পড়ে] সবাই এস শুরু করি।

মেদভাদেনকো : কী আর হবে, মাত্র চার মাইল তো পথ। [স্ত্রীর হাতে চুমু খায়] আমি তাহলে আসি। [পোলিনাকে] মা আসি। [পোলিনা অনেকটা অনিচ্ছায় হাত বাড়িয়ে দেয়] বাচ্চাটা বাড়িতে না থাকলে আপনাদের বিরক্ত করতাম না। [সবার প্রতি মাথা নোয়ায়] আসি। [অপরাধীর মতো বেরিয়ে যায়]

সামারায়েভ : অবশ্যই হাঁটবে। নিজেকে ও কি একজন জেনারেল ভাবে নাকি?

পোলিনা : [হাত দিয়ে টেবিলের ওপর ছোট ছোট শব্দ করে] এই এস তোমরা, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। একটু পরেই আবার খাবার ডাক পড়বে। [সামারায়েভ, মাশা এবং ডোরন টেবিলে বসে]

আইরিনা : [ট্রিগোরিনকে] যখনই শরতের বিলম্বিত বিকেলগুলো আসে আমরা এখানে থাকলে লোটো খেলতে বসে যাই। দেখ, এই লোটো সেটটা আমার মা'র আমলের। আমরা তখন ছোট। মা আমাদের সাথে খেলত। বোসো না, খাবার আগ পর্যন্ত তো তুমি আমাদের সাথে খেলতে পার। [ট্রিগোরিনকে নিয়ে বসে পড়ে] খেলাটা একটু ঢিমাতালের। তবে একবার আয়ত্তে এলে আর খারাপ লাগে না। [সবাইকে তিনটি করে তাস বেটে দেয়]

ত্রেপলেভ : [পত্রিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে] ট্রিগোরিন শুধু তার নিজের গল্পই পড়েছে। আমার গল্প দেখেওনি। বইয়ের পাতাগুলো এখন পর্যন্ত কাটা হয়নি। [টেবিলের উপর পত্রিকাটি রেখে বাঁদিকের দরজার দিকে যায়। মা'র পাশ দিয়ে যাবার সময় তার মাথায় ঠোঁট ছোঁয়ায়।]

আইরিনা : কোস্টিয়া, খেলবে না?

ত্রেপলেভ : না মা, ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে বাইরে একটু হাঁটি।

আইরিনা : সবাই দশ কোপেক করে রাখ! ডাক্তার আমারটা দিয়ে দাও।

ডোরন : অবশ্যই।

মাশা : সবাই দিয়েছে? হ্যাঁ, শুরু করছি। বাইশ।

আইরিনা : পেয়েছি।

মাশা : তিন।

ডোরন : ঠিক আছে।

মাশা : আপনি তিন খেলেছেন? আট! একাশি! দশ!

সামারায়েভ : আরে, আস্তে ধীরে।

আইরিনা : কারকোভে ওরা আমাকে কী দারুণ সংবর্ধনা দিল! মনে করলেও মাথা ঘোরে।

মাশা : চৌত্রিশ। [নেপথ্যে দুঃখভরা ওয়ালজ-এর সুর শোনা যায়]

আইরিনা : ছাত্ররা তো আমাকে নিয়ে রীতিমতো একটা উৎসব করে ফেলল। বড় বড় তিন বাক্স ফুল, দুটো মালা আর এই ব্রুচটা। [গলার কাছ থেকে ব্রুচটা খুলে টেবিলের উপর শব্দ করে রাখে]

সামারায়েভ : দারুণ ব্যাপার তো!

মাশা : পঞ্চাশ।

ডোরন : তুমি কত বললে? পঞ্চাশ?

আইরিনা : কাপড়চোপড়ও পরেছিলাম! একেবারে ঝলমলে। সত্যি সত্যি যাকে বলে পুরোদস্তুর সাজগোজ।

পোলিনা : কোস্টিয়া আবার পিয়ানো বাজাচ্ছে। ছেলেটার যে কী হল!

সামারায়েভ : পত্রপত্রিকাতেও আজকাল ওকে নিয়ে বিরুদ্ধ-সমালোচনা হচ্ছে।

মাশা : সাতাত্তুর!

আইরিনা : তাতে ওর দুঃখ পাবার কী আছে? অমন তো কতই লেখে।

ট্রিগোরিন : এটা কিন্তু ভালো নয়। ওর লেখার নির্দিষ্ট কোনো কিছু নেই। লেখার স্টাইলও যেন কেমন অস্পষ্ট, জীবন্ত হয়ে ওঠে না।

মাশা : এগার!

আইরিনা : [ঘুরে সোরিনের দিকে তাকায়] বিরক্ত হচ্ছে পেট্রুশা? [নীরবতা] এর মাঝে ঘুমিয়ে গেছে।

ডোরন : হ্যাঁ, আইনজীবী ঘুমিয়ে গেছে।

মাশা : সাত! নব্বই!

ট্রিগোরিন : এই লেকের পাশে এরকম একটি জায়গায় যদি আমি থাকতাম তাহলে হয়তো কোনোদিনই আমার লেখালেখি হত না। ওসব আবেগ-টাবেগ ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে শুধু মাছ ধরতাম।

মাশা : আটাশ!

ট্রিগোরিন : শুধু পার্শ ধরতাম।

ডোরন : তোমরা যাই বল কনস্টানটিন গেভ্রিলোভিচের ক্ষমতায় আমার পূর্ণ আস্থা আছে। তার মধ্যে মৌলিক প্রতিভা আছে। তার চিন্তা প্রকাশিত হয় চিত্রকল্পে। গল্পগুলো কী স্পষ্ট, বিচিত্র, যেন রঙধনু রঙে রাঙানো। ব্যক্তিগতভাবে আমার অসম্ভব ভালো লাগে। এটা অবশ্য খারাপ যে তার নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য নেই। একটা কিছুর ছাপ রাখে শুধু। কিন্তু শুধু ছাপ রেখে তো আর বেশি দূর এগোনো যায় না। আইরিনা নিকোলাইয়েভনা, আপনার ছেলে লেখক হয়েছে ভাবতে আপনার ভালো লাগে না?

আইরিনা : তার কোনো লেখা পড়ারই আমার সময় হয়নি।

মাশা : ছাব্বিশ!

ত্রেপলেভ : [ধীরে ধীরে প্রবেশ করে ডেস্কের দিকে যায়]

সামারায়েভ : [ট্রিগোরিনকে] ওহো—বরিস আলেক্সইভিচ আপনার একটা জিনিস এখনো আমাদের কাছে আছে।

ট্রিগোরিন : কী জিনিস!

সামারায়েভ : কনস্টানটিন গেভ্রিলোভিচ একদিন একটি গাঙচিল মেরেছিল, মনে আছে? গাঙচিলটা শুকিয়ে রাখতে বলেছিলেন।

ট্রিগোরিন : বলেছিলাম নাকি? [চিন্তা করে] নাহ, ঠিক মনে পড়ছে না।

মাশা : ছেষট্টি! এক!

ত্রেপলেভ : [জানালা খুলে কিছু শোনার চেষ্টা করে] কী ঘুটঘুটে অন্ধকার! আহ—কেন এমন অস্থির লাগছে? কী হচ্ছে কে জানে।

আইরিনা : কোস্টিয়া, জানালাটা বন্ধ করে দাও না, বাতাস আসছে। [ত্রেপলেভ জানালা বন্ধ করে]

মাশা : আটাশি!

ট্রিগোরিন : আমি পেয়েছি।

আইরিনা : [আনন্দিত] শাবাশ! শাবাশ!

সামারায়েভ : দারুণ তো!

আইরিনা : ও সবকিছুতেই ভাগ্যবান। [উঠে পড়ে] খাবার সময় হয়ে গেল। দেখ দেখি, আসল লোকটিই সারাদিন কিছু খায়নি। চল উঠি। খাবার পর আবার কিছু সময় খেলা যাবে। [ছেলেকে] কোস্টিয়া, লেখা ছেড়ে এস খেয়ে নাও।

ত্রেপলেভ : আমার খিদে নেই মা, তোমরা খাও।

আইরিনা : ঠিক আছে। [সোরিনকে তোলে] পেট্রুশা খাবে চল। [সামারায়েভের হাত ধরে] এস তোমাকে কারকোভের সংবর্ধনার কথা বলি।...[পোলিনা টেবিলের মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়। ডোরন ও পোলিনা সোরিনের চেয়ার ঠেলে নিয়ে বেরিয়ে

যায়। ত্রেপলেভ ছাড়া সবাই বেরিয়ে যায়। ত্রেপলেভ তার ডেস্কে বসে থাকে।]

ত্রেপলেভ : [লেখার প্রস্তুতি নেয়। তার আগে যতটুকু লেখা হয়েছে তা পড়তে শুরু করে।] শিল্পে নতুন ধারা নতুন ফরম সম্বন্ধে এক সময় আমি অনেক কথা বলেছি, কিন্তু এখন দেখছি, ক্রমে ক্রমে অনুভব করছি আমি নিজেই ধীরে ধীরে একটা আবর্জনায় পরিণত হচ্ছি। কী এক অদৃশ্য নিয়মের নিগড়ে [পড়ে] 'প্রাচীর পত্রে লেখা ঘন কেশের ফ্রেমে বাঁধা একটি বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখ। ঘোষণা হচ্ছে ঘন কেশের ফ্রেমে বাঁধা একটি বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখ। ঘোষণা—ঘন কেশের ফ্রেমে বাঁধা একটি পাণ্ডুর মুখ—পাণ্ডুর মুখ।' বাজে। [লেখাটা কেটে ফেলে] নাহ্ আমি সেখান থেকেই আবার শুরু করব যেখানে নায়ক বৃষ্টির রিমঝিম শব্দে জেগে ওঠে। আর সব বাদ। নাহ, জোছনা রাতের বর্ণনায় জোছনাও ফোটেনি। ট্রিগোরিনের আয়ত্তে তার নিজস্ব একটি রচনাকৌশল আছে। বর্ণনাগুলো কত সহজে আসে। কী চমৎকারভাবে ফোটে। মিল স্রোতে একটি ভাঙা বোতলের মুখ চকচক করে ওঠে। মিল চাকার কালোছায়া পড়ে বামোন জলপীরায় ব্যস, এতেই তার জোছনা ফুটে ওঠে। কী চমৎকার! আর আমার! তিরতির করে কাঁপা আলো, নিঃশব্দ মিটিমিটি তারা এবং সুদূর পিয়ানোর রেশ নিথর সুরভিত বাতাসে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়—নাহ্—বাজে। জীবন নেই—শক্তি নেই। এর মাঝে কথ্য ভাষার নির্ঝর-গতি নেই। [নীরবতা] হ্যাঁ, এখন তো বিশ্বাস হচ্ছে নতুন পুরাতন ধারণা বা ধারায় কিছুই যায়-আসে না। সেটা কোনো ব্যাপারই নয়। আসলেই যেটা প্রয়োজন সেটা কোনো ফরম নয়, কোনো নির্দিষ্ট ধারণা নয়—শুধু লেখা, গলগল করে লিখে যাওয়া। অন্তর্গত অস্তিত্ব থেকে হু-হু করে বেরিয়ে আসা চাই সে লেখা। যার যা বলার আছে, ভেতর থেকে যা বেরিয়ে আসতে চায় তাকে ভড়ং বিনাই প্রকাশ করা। এই তো হওয়া উচিত। [ডেস্কের পাশের জানালায় কে যেন টোকা দেয়] কী ওখানে? [জানালার ভিতর দিয়ে দেখে] কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। [ফ্রেঞ্চ দরজা খুলে বাগানের দিকে তাকায়] কে যেন সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে। [ডাকে] কে? কে ওখানে? [বাইরে যায় এবং তার দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা যায়। আধ মিনিট পর নীনাকে নিয়ে ফিরে আসে।]
নীনা! নীনা! [নীনা ত্রেপলেভের বুকের ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ওঠে]

ত্রেপলেভ : [আনন্দে উত্তেজিত] নীনা! নীনা! তুমি—তুমি নীনা! আমি জানতাম তুমি আসবে। সারাদিন এ-কথাই আমার বুকের মাঝে বাঁশির সুরের মতো বেজেছে। [নীনার হ্যাট ও কোট খুলে দেয়] নীনা, লক্ষ্মীমণি আমার, তুমি এসেছ। শেষ পর্যন্ত এলে। আমার জীবনের জন্যই ফিরে এলে। কেঁদ না। লক্ষ্মী মেয়ে, কেঁদ না।

নীনা : এখানে কেউ আছে?

ত্রেপলেভ : না, কেউ নেই।

নীনা : দরজায় তালা লাগাও, কেউ যেন না আসে।

ত্রেপলেভ : না কেউ আসবে না।

নীনা : আমি জানি আইরিনা নিকোলাইয়েভনা এখানে আছেন। তালাটা দিয়েই দাও।

ত্রেপলেভ : [ডানদিকের দরজায় তালা লাগিয়ে বাঁ দিকে চলে আসে] এটার কোনো তালা নেই। একটা চেয়ার দিয়ে ঠেলে রাখি। [দরজায় একটি চেয়ার ঠেলে দেয়] ভয় পেও না, কেউ আসবে না।

নীনা : [ত্রেপলেভের মুখের ওপর অপলক চেয়ে থাকে] কিছু সময় তোমাকে দেখতে দাও। [ঘুরে তাকায়] ঘরটা কী সুন্দর গরম। এটা ড্রইংরুম ছিল না? আচ্ছা, আমার কি অনেক পরিবর্তন হয়েছে?

ত্রেপলেভ : শুধু একটু পাতলা হয়েছ, আর চোখ দুটো আরো ডাগর হয়েছে। নীনা, আবার তোমার দেখা পেলাম, কী অদ্ভুত, তাই না! বল, আগে কেন দেখা দাওনি! এখানে আসার কথা বলেছিলে শুনেছি। কেন? জানি তুমি সপ্তাহখানেকের মতো এই শহরেই আছ। আমি প্রতিদিনই তোমার হোটেলে গিয়েছি, কোনোদিন অনেক বার—তোমার জানালার নিচে ভিখিরির মতো দাঁড়িয়ে থেকেছি।

নীনা : ভয় হত তুমি আমাকে ঘৃণা করবে। প্রতিরাতে স্বপ্ন দেখি তুমি আমার দিকে চেয়ে আছ কিন্তু চিনতে পারছ না। তুমি বুঝবে না, এখানে আসার পর প্রতিদিন লেকের আশপাশে ঘোরাঘুরি করেছি। বাড়ির কাছেও বহুবার এসেছি কিন্তু ভিতরে আসার সাহস হয়নি। চল বসি। [উভয়ে বসে] বসে বসে শুধু কথা বলি, শুধু কথা—আহা! কী যে ভালো লাগছে—গরম, কী যে আরাম! বাতাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছ—তুর্গেনেভের একটি লাইন আছে, 'ঝড়ো রাতে যার নিজস্ব একটু উষ্ণ ঠাঁই ও মাথার ওপর ছাদ আছে সেই জগতে সুখী।' আমি গাঙচিল, নাহ্—শুধু তাই নয়। [কপাল রগড়ায়] হ্যাঁ, কী বলছিলাম? ও হাঁ, তুর্গেনেভ, 'এবং ছিন্নমূল ভবঘুরেদের ঈশ্বরই রক্ষা করেন।' অবশ্য এতে কিছু যায় আসে না। [কান্নায় ভেঙে পড়ে]

ত্রেপলেভ : নীনা। নীনা—আবার কাঁদছ? নীনা।

নীনা : কাঁদতে দাও, লক্ষ্মীটি একটু কাঁদতে দাও। কাঁদলে দুঃখ কমে। দু বছরে আমি কখনো কাঁদিনি। গতকাল সন্ধ্যায় দিকে আমাদের সেই মঞ্চটা আছে কিনা দেখার জন্যে একবার বাগানে ঢুকেছিলাম। দেখলাম এখনো দাঁড়িয়ে আছে। দু বছরে কালই প্রথম কেঁদেছি। মনে হল বিশাল এক ভার নেমে গেল, বড় ভালো লাগল। নিজেকে ঝরঝরে মনে হল। এখন আর কাঁদছি না। [ত্রেপলেভের হাত মুঠোর মধ্যে নেয়] তুমি তো এখন লেখক হয়ে গেছ। তুমি লেখক আর আমি অভিনেত্রী। একই ঘূর্ণাবর্তে দুজন আবার একত্রিত হয়েছি। ছোটবেলা থেকে কী আনন্দে এখানে বড় হয়েছি—সকালে গানে গানে ঘুম ভেঙেছে। আমি তোমাকে ভালোবেসেছি আর খ্যাতির স্বপ্ন দেখেছি।—আর এখন? কাল খুব ভোরে বাসে ইয়েলিয়েজ যাব। চাষাভুষাদের সহযাত্রী। ইয়েলিয়েজের ধনকুবের লম্পটগুলো তাদের কামুক চোখ দিয়ে আমাকে লেহন করবে, জ্বালাতন করবে, ওহ্—জীবন সত্যিই কী জঘন্য!

ত্রেপলেভ : ইয়েলিয়েজ কেন?

নীনা : শীতের সময়ে ওখানে একটা কাজ নিয়েছি।

ত্রেপলেভ : আমি তোমাকে অভিসম্পাত করেছি, ঘৃণা করেছি। তোমার সব ছবি আর সবগুলো চিঠি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিয়েছি কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তেই জানতাম আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার দেহের প্রতিটি ইঞ্চি তোমাকে ভালোবাসে—আজীবন ভালোবাসবে। নীনা, আমি তো তোমাকে ভালো না বেসে পারি না! চাইলেও তো তোমাকে ঘৃণা করতে পারি না। নীনা, যখন থেকে তোমাকে হারিয়েছি, যখন থেকে আমার লেখা প্রকাশ হতে শুরু করেছে তখন থেকেই জীবন আমার কাছে অসহ্য। সুখ নেই। মনে হয় আমার থেকে আমার যৌবন কেড়ে নেয়া হয়েছে। মনে হয় অনেক আগেই নব্বুই পেরিয়েছি। আমি চিৎকার করে তোমার নাম ধরে ডাকি। যে পথে তুমি একদিন হেঁটেছ সে পথের ধুলোয় চুমু খাই, যেখানে যাই শুধু তুমি, সেই হাসি যা আমার সুখের শান্তির দিনগুলোকে উজ্জ্বল করত।

নীনা : [হতবুদ্ধি, স্বগত] অমন কথা বলছ কেন? কেন বলছ?

ত্রেপলেভ : আমি একা। উষ্ণতা দেবার কোনো ভালোবাসা নেই। সমগ্র সত্তায় আমি শীতল। মনে হয় যুগ যুগ ধরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার

মৃত্যুকূপে পড়েছিলাম। আমি যা কিছু লিখি সব কেমন নির্জীব, নিষ্প্রাণ, ম্লান মনে হয়। নীনা, তুমি যেও না। দোহাই তোমার যেও না। না হয় তো আমাকে নাও তোমার সাথে। [নীনা তাড়াতাড়ি তার কোট ও হ্যাট পরে নেয়] নীনা, তুমি চলে যাবে? কী হয়েছে নীনা?

[তাকিয়ে নীনার কাপড় পরা দেখে। নীরবতা।]

নীনা : গেটের কাছে ঘোড়া আছে। তোমার আসার দরকার নেই। আমি একাই যেতে পারব। [ছলছল চোখে] একটু পানি দাও।

ত্রেপলেভ : [পানি দেয়] এখন কোথায় যাবে?

নীনা : শহরে। [নীরবতা] আইরিনা নিকোলাইয়েভনা এখানে আছে তাই না?

ত্রেপলেভ : হ্যাঁ। মামা গত বৃহস্পতিবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মাকে তার করে এনেছি।

নীনা : আমার হাঁটা পথের ধুলায় তুমি চুমু খেয়েছ এ-কথা কেন বললে? আমার আত্মহত্যা ছাড়া তো পথ নেই। [টেবিলের ওপর নুয়ে পড়ে] আহ্—আমি ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম নিতে পারলে বোধ হয় ভালো হত।—একটু বিশ্রাম। [মাথা উঠিয়ে] আমি একটি গাঙচিল। না তা নয়। আমি একজন অভিনেত্রী। তাতেই-বা কী পার্থক্য আছে? [নেপথ্যে আইরিনা ও ট্রিগোরিনের হাসি। নীনা শোনে, দৌড় দিয়ে বাঁদিকের দরজার দিকে চলে যায়। চাবির ছিদ্রে চোখ লাগিয়ে দেখে] তাহলে সে-ও এখানে। [ত্রেপলেভের কাছে ফিরে আসে] সে-ও তাহলে...অবশ্য এটা কোনো ব্যাপার নয়—হ্যাঁ, সে থিয়েটারে বিশ্বাস করত না। আমার সব স্বপ্ন নিয়ে তাচ্ছিল্যভরে হাসত। ধীরে ধীরে আমিও ওকে অবিশ্বাস করতে শুরু করছিলাম। এক সময় বিশ্বাসই হারিয়ে বসলাম। ঈর্ষা এল। ভালোবাসায় চিড় ধরল। তার ওপর বাচ্চার জন্য অবিরাম উদ্বেগ। আমি এক সময় শুকিয়ে গেলাম। অভিনয় খারাপ হতে লাগল। হাত দুটো নিয়ে কী করব বুঝতে পারতাম না। কীভাবে দাঁড়াব, কীভাবে কণ্ঠ থেকে শব্দ ছুড়ব কিছুই বুঝতে পারতাম না। যা করছি তা ভালো হচ্ছে না এটা বুঝতে পারলে যে জ্বালা তা তুমি ভাবতেও পারবে না। আমি আসলেই একটা গাঙচিল। না তা নয়। মনে আছে? একদিন তুমি একটা গাঙচিল মেরেছিলে? হঠাৎ করে একজন মানুষ এসে তাকে দেখল, তাকে ধ্বংস করল শুধু সময় কাটানোর জন্য। শুধু ছোট্ট একটা গল্প সৃষ্টির জন্য। না—তা-ও না। [কপাল রগড়ায়] আমি যেন কী বলছিলাম?

ওহ্—হ্যাঁ মঞ্চের ব্যাপার। আমি এখন অন্য নীনা। অভিনেত্রী। যথার্থই অভিনেত্রী। এখন অভিনয় আমার ভালো লাগে, আনন্দ পাই। মঞ্চ আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। যতক্ষণ মঞ্চের উপর থাকি নিজেকে ভারি সুন্দর লাগে। এ ক'দিন আমি পথে পথে হেঁটেছি আর চিন্তা করেছি। যতই চিন্তা করছি ততই আমার মানসিক শক্তি বেড়েছে। কোস্টিয়া, আমি এখন জানি, যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার—সে লেখক হই কিংবা অভিনেত্রী, যাই হই খ্যাতি অথবা চাকচিক্য নয় অথবা একদিন যা কিছু স্বপ্ন দেখেছি তার একটিও নয়—কেবল সহিষ্ণুতা। জীবনের অশুভকে সহ্য করতে শিখতে হবে এবং যেভাবেই হোক বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এখন আমার বিশ্বাস আছে। যে কোনো আঘাতকেই প্রতিহত করার শক্তি আছে। জীবনকে এখন আর আমার ভয় করে না।

ত্রেপলেভ : তুমি তোমার পথ পেয়েছ। কোনদিকে চলেছ সেটা তুমি জান। কিন্তু আমি তো এখনো চিত্রকল্প আর দুঃস্বপ্নের গোলকধাঁধায় পড়ে আছি। এখনো তো জানি না আমার উদ্দেশ্য কী? আমার কোনো বিশ্বাস নেই, কোনো গন্তব্য নেই।

নীনা : ইস্-স। আমি যাই। আসি লক্ষ্মীটি। আমি কোনো দিন ভুবন-বিখ্যাত অভিনেত্রী হলে এসে আমার অভিনয় দেখো। কী? দেখবে? কিন্তু এখন...

[ত্রেপলেভের হাতে মৃদু চাপ দেয়]

দেরি হয়ে গেছে। আমি খুব ক্লান্ত, দাঁড়াতে পারছি না। ক্লান্তি আর ক্ষুধা।

ত্রেপলেভ : দাঁড়াও। তোমার জন্যে খাবার নিয়ে আসি।

নীনা : না না, এস না। আমি একাই যেতে পারব। ঘোড়া কাছেই আছে। তাহলে তোমার মা তাকেও এখানে এনেছেন। আনুক গে—আমার কী? ট্রিগোরিনকে কিছু বোলো না—আমি তাকে ভালোবাসি। আগের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। ছোটগল্পের প্লট...হ্যাঁ, আমি তাকে ভালোবাসি। পাগলের মতো ভালোবাসি। দিগ্বিদিকশূন্য হয়েই ভালোবাসি। তোমার মনে আছে কোস্টিয়া? আমরা কত ভালো ছিলাম। কত পবিত্র ছিল আমাদের জীবন! কেমন একটা অনুভূতি ছিল। তাই না? ফুলের মতো সুন্দর কোমল। মনে আছে—[আবৃত্তি] 'সকল মানুষ, সিংহ, ঈগল, তিতির, হরিণ, রাজহাঁসের দল চলে গেছে। চলে গেছে মাকড়সা, তারামাছ ও অতলান্ত সাগরের সব নীরব মাছেরা এবং অদৃশ্যপ্রায়

সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী। চলমান সব জীবন্ত বস্তু, সব, সকলেই তাদের দুঃখের পালা সম্পূর্ণ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তারপর সহস্র সহস্র বছর আর কোনো জীবন্ত কিছু প্রসব করেনি এই ধরিত্রী। তবু, তবু ঐ একা চাঁদ অসহায় অর্থহীন আলো ছড়ায়। কোথাও কোনো খোলা মাঠে সহসা কোনো সারস আর ডেকে ওঠে না। গুবরে পোকাদের একটানা শব্দ এখন আর নেই কোনো বাতাবিলেবুর ঝোপে।'

[আবেগে ত্রেপলেভকে জড়িয়ে ধরে। তারপর ফ্রেঞ্চ দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যায়।]

ত্রেপলেভ : [নীরবতা] হায় ঈশ্বর! কেউ যেন ওকে দেখে না-ফেলে। মা জানতে পারলে তার উদ্বেগের সীমা থাকবে না। [পরবর্তী দুই মিনিট ত্রেপলেভ তার সব পাণ্ডুলিপি, কাজগপত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে টেবিলের নিচে ছুড়ে ফেলে দেয়। তারপর ডানদিকের দরজার তালা খুলে বেরিয়ে যায়।]

ডোরন : [বাঁদিকের দরজা খোলার চেষ্টা করে] আরে, দরজা বন্ধ মনে হচ্ছে। [ভিতরে এসে চেয়ারটা আগের জায়গায় রাখে] একটা নিয়মিত প্রতিবন্ধকতা ছাড়া এখানে আমাদের আর কী আছে? [আইরিনা ও পোলিনা প্রবেশ করে। ইয়াকোভ কতকগুলো বোতল নিয়ে তাদের অনুসরণ করে। তারপর আসে মাশা, সামারায়েভ ও ট্রিগোরিন।]

আইরিনা : বরিসের জন্য এই লাল মদ আর বিয়ারটা রাখ। খেলার সময় হয়তো লাগবে। সবাই চল আবার বসে যাই।

পোলিনা : [ইয়াকোভকে] চা-ও নিয়ে এস। [মোমবাতি জ্বালিয়ে তাসের টেবিলে বসে]

সামারায়েভ : [ট্রিগোরিনকে কাবার্ডের কাছে নিয়ে যায়] যে জিনিসটার কথা আপনাকে বলেছিলাম সেটা এখানেই আছে। [কাবার্ড থেকে শুকনো গাঙচিল বের করে] এটার কথাই আপনি বলেছিলেন।

ট্রিগোরিন : [গাঙচিলটার দিকে চেয়ে] মনে পড়ছে না। [ভেবে] না একেবারেই মনে পড়ছে না। [ডানদিকে নেপথ্যে একটা গুলির শব্দ শোনা যায়। সবাই চমকে ওঠে।]

ডোরন : [ভয়ের কিছু নেই] নির্ঘাত আমার ওষুধের কেসে কিছু একটা ঘটেছে। [ডানদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। আধ মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে আসে।] যা ভেবেছিলাম তাই। ইথারের বোতলে বিস্ফোরণ। [গুনগুন করে] 'আবার বিমুগ্ধ আমি দাঁড়াব তোমার সম্মুখে।'

আইরিনা : হায় ঈশ্বর! দারুণ ভয় পেয়েছিলাম। [টেবিলে বসেই] শব্দটায় আমার সে দিনের কথা মনে... [হাত দিয়ে মুখ ঢাকে] মুহূর্তের জন্য সব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল প্রায়।

ডোরন : [একটা পত্রিকা উল্টাতে উল্টাতে ট্রিগোরিনকে] দু মাস আগে এখানে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। আমেরিকার একটি চিঠি—সে সম্পর্কে আপনাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম। [ট্রিগোরিনের কোমরে হাত রাখে এবং ডাউন স্টেজ-এ নিয়ে যায়] ঐ ব্যাপারটায় আমার দারুণ উৎসাহ আছে [কণ্ঠ নামিয়ে। ফিসফিস করে।] আইরিনা নিকোলাইয়েভনাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। শব্দটা আসলেই গুলির। ঘটনাটা ঘটেই গেছে। কোস্টিয়া নিজেকে গুলি করেছে...।

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র